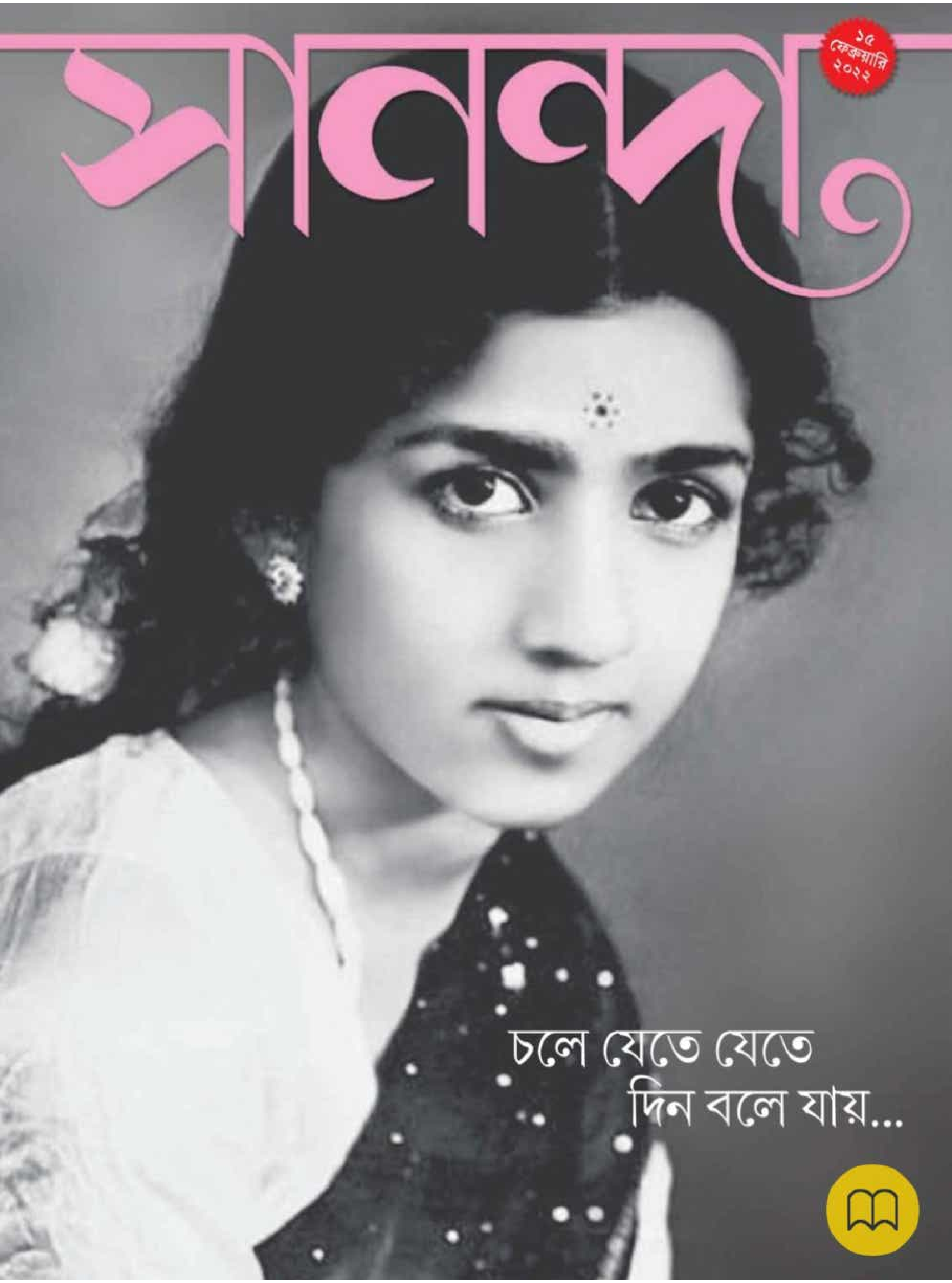

সানন্দা
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২
চলে যেতে যেতে
দিন বলে যায়...

একমেবাদ্বিতীয়ম...

লতা মঙ্গেশকর

ইন্দ্রাণী ঘোষ



কিশোরী লতা

*কোন মন্ত্রবলে **লতা মঙ্গেশকর** হয়ে উঠলেন ভারতীয় উপমহাদেশের জীবন্ত সরস্বতী? কেমন ছিল তাঁর জীবনের শুরুর দিনগুলো? পাতা উলটে দেখলেন ইন্দ্রাণী ঘোষ।*



বাবার সঙ্গে প্রথমবার মঞ্চে গাওয়ার সময় পাবলিসিটির জন্য তোলা, ১৯৩৮ সাল

সেদিন ১৯৪৮ সালের এক সকাল। তৎকালীন বম্বে শহরের উপকণ্ঠে মালাডের রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছেন বছর ১৯-এর ছিপছিপে এক তরুণী। গন্তব্য, বম্বে টকিজ় স্টুডিয়ো। লোকাল ট্রেন থেকে নেমে স্টুডিয়োয় যেতে ৬-৭ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য যেখানে টাঙা নেওয়াই দস্তুর, সেখানে হনহনিয়ে হাঁটছেন তিনি। চোখে-মুখে দৃঢ় সংকল্প। বম্বে টকিজ়ে গিয়ে সারাদিন গান রেকর্ড করবেন তরুণী। দিনান্তে ফেরার পথে আবার হেঁটে স্টেশনে আসবেন। টাঙায় না চড়ে যে পয়সা জমবে, সেখান থেকেই ট্রেনে ওঠার আগে স্টেশন থেকে বাড়ির জন্য সবজি

কিনে নিয়ে যাবেন তিনি।



সপরিবার

কাট টু ২০২২। ৬ ফেব্রুয়ারি। সেদিনের সেই তরুণী আজ নবতিপর, অন্তিম শয্যায় শায়িত। ফুলে-ফুলে ঢেকে যাচ্ছে শরীর। শেষযাত্রায় যখন পাড়ি দিচ্ছেন আসমুদ্র হিমাচলের কয়েকশো কোটি মানুষকে শোকস্তব্ধ করে, তখন বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ নাকি প্রায় ৩৭০ কোটি টাকা (মতান্তরে ১০৭-১১৫ কোটি)! গ্যারেজে সজ্জিত বেশ কিছু দুর্দান্ত গাড়ি। প্রতি মাসে গানের রয়্যালটি বাবদ আয় ৪০ লক্ষ টাকা, যার পরিমাণ বছরে প্রায় ৬ কোটি টাকা!



বাবা দীননাথ, মা সেবন্তী ও অন্যান্য ভাইবোনদের সঙ্গে

আজ্ঞে হ্যাঁ, এই হচ্ছেন লতা মঙ্গেশকর। যাঁকে শুধু এই ভারতীয় উপমহাদেশেই নয়, তামাম বিশ্ব চেনে এক ডাকে। যাঁর সাত দশক ব্যাপী দীর্ঘ কেরিয়ারে গাওয়া হয়ে যায় ৩৬ টি ভাষায় প্রায় ৩০ হাজারেরও বেশি গান! যাঁর গানের সুরেলা জাদুতে মন্ত্রমুগ্ধ থাকেন লাখো শ্রোতা, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে, দশকের পর দশক জুড়ে। যাঁর কণ্ঠে 'ইয়ে জিন্দগি উসিকি হ্যায়' শুনে স্বয়ং উস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খান বলেন, "কামবখত ইয়ে লড়কি কভি

বেসুরি নহি হোতি!"

'...রাস্তা মুশকিল...মালুম নহি হ্যায় কাঁহাঁ মনজ্বিল'

কিন্তু সেদিনের সেই তরুণী কোন জাদুবলে করল এই অসাধ্য সাধন? 'তু জাঁহা জাঁহা চলেগা, মেরা সায়া সাথ হোগা'র মতো অমোঘ সংগীতকে সত্যি করে কোন রহস্যেই বা আম-ভারতীয়ের জীবনের সঙ্গে জুড়ে গেলেন এমন ওতপ্রোতভাবে, তাঁর 'আওয়াজ়'-কেই এক এবং একমাত্র পরিচয় করে? জানতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে লতা মঙ্গেশকরের জীবনের একেবারে শুরুতে।



'আইডল' নুর জাহানের সঙ্গে

লতা মঙ্গেশকরের জন্ম ১৯২৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর। বর্তমান মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে। পিতা দীননাথ মঙ্গেশকর ছিলেন মরাঠি সংগীত ও নাট্যজগতের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। তাঁদের পদবি আগে ছিল হার্দিকর। পরে জন্মস্থান গোয়ার মঙ্গেশি গ্রামের নামে নিজের পদবি বদলে নেন 'মঙ্গেশকর'-এ। লতার নিজের জবানিতে, "তখন বাড়িতে সারাক্ষণ গানের চর্চা হত। বাবা খুব রক্ষণশীল ছিলেন। নিজে নাটক করলেও ছেলে-মেয়েরা নাটক দেখবে, এ ছিল তাঁর না-পসন্দ।" ফলে রান্নাঘরের বাসন রাখার তাকে উঠে ছোট্ট লতা মায়ের সামনে ছাত্রদের শেখানো বাবার গান বা প্রিয় গায়ক কে.এল. সায়গলের গান গাইলেও দীননাথের সামনে কখনও গাইতেন না। এরপরেই আসে সেই অমোঘ সময়। লতার বয়স তখন মোটে পাঁচ। ছাত্রকে রেওয়াজ করতে বলে কাজে বেরিয়েছিলেন দীননাথ। ফিরে এসে দেখেন, ছোট্ট লতা কখন যেন তাঁর তাল, লয় আয়ত্ত করে তাঁরই ছাত্রের ভুল ধরিয়ে দিচ্ছে! লতার কথায়, "বাবাকে দেখেই আমি পালিয়ে যাই।



মা সেবন্তী

পরে শুনেছিলাম, মাকে তিনি বলেছিলেন, 'ঘরে এমন ওস্তাদ মেয়ে থাকতে আমি বাইরে গান শেখাই!' এর পরদিনই সকাল ছ'টায় ঘুম থেকে তুলিয়ে তানপুরা নিয়ে রেওয়াজে বসিয়েছিলেন বাবা। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংগীত শিক্ষার সেই শুরু।" ছোট্ট লতার 'লতা মঙ্গেশকর' হয়ে ওঠার যাত্রার সূচনাও বোধহয় তখন থেকেই। বাবা বাড়িতে কে. এল. সায়গল ছাড়া আর কারও গান শুনতে দিতেন না। কঠোর অনুশীলনে বেশ কয়েকবছর থাকার পর লতার জীবনে প্রথম স্টেজ শোয়ের সুযোগ আসে। শোলাপুরে থাকাকালীন দীননাথের এক ক্লাসিকাল সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন হয়, ন'বছরের পুঁচকে লতা সেখানে বাবার সঙ্গে স্টেজে গাওয়ার জন্য বায়না ধরে। দীননাথ প্রথমে আপত্তি করলেও পরে রাজি হয়ে যান। নিজে গাওয়ার পর বাবার গানের সময় স্টেজে বাবার কোলে মাথা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি, এই ছিল লতার প্রথম স্টেজ শোয়ের স্মৃতি!

প্রথম রেকর্ডই বাদ!



'মেন্টর' গুলাম হায়দর

লতার জীবনের প্রথম রেকর্ডিংয়ের গল্পও কিন্তু মজার। তখন ১৯৪২ সালের মার্চ মাস। বসন্ত যোগলেকরের পরিচালনায় তৈরি হবে মরাঠি ছবি 'কিটি হসাল'। ছবির সংগীত পরিচালক দীননাথের বন্ধু। তিনিই দীননাথের কাছে আবদার জানিয়ে বসলেন, এ ছবির এক গানের জন্য লতাকে চাই! মেয়ে সিনেমায় গান গাইবে, এ বাবা মোটেই চাইতেন না। শেষমেশ বন্ধুর জেদের কাছে হার মেনে রাজি হলেন। ১৩ বছর বয়সে রেকর্ড হল লতা মঙ্গেশকরের প্রথম মরাঠি গান 'খেলু সারি মানি হাউস ভারি'। যদিও সে গান দিনের আলো দেখেনি। কোনও এক কারণে 'কিটি হসাল' থেকে বাদ পড়ে যায় গানটি। এই প্রসঙ্গে পরে তিনি জানিয়েছিলেন, "ততদিনে বাবার সঙ্গে স্টেজ শো করে ভয় কেটে গিয়েছিল। ফলে রেকর্ডিংয়ে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি, ভয়ও করেনি!"

লড়াই, লড়াই, লড়াই...



লতা, আশা, উষা, মীনা, চার বোন, ছোট আদরের ভাই হৃদয়নাথ, আর বাবা-মা। এই নিয়ে আনন্দে ছোটবেলা কাটলেও আচমকা মঙ্গেশকর পরিবারে নেমে এল দুর্যোগ। ১৯৪২-এর এপ্রিল মাসে মারা গেলেন দীননাথ। পরিবারের বড় মেয়ে লতা। ফলে অচিরেই মাত্র ১৩ বছর বয়সে সংসার চালানোর গুরুদায়িত্ব এসে পড়ল ছোট্ট লতার কাঁধে। ছোট বোন আশাকে নিয়ে স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে মাত্র একদিন গিয়েই স্কুল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি। ফলে ছিল না প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও। অতএব বাবার শেখানো গানকে পাথেয় করে একপ্রকার বাধ্য হয়েই অভিনয় করতে শুরু করেন তিনি। ভাগ্যক্রমে এইসময়েই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় মাস্টার বিনায়ক দামোদর কর্ণাটকির। বিনায়কের 'প্রফুল্ল পিকচার্স'-এ 'চাকরি' হয় লতার। তার মধ্যেই প্রবল আর্থিক কষ্ট দেখা দেওয়ায় 'পুনা'র বাড়ি বিক্রি করে ভাড়া বাড়িতে উঠে যান।



সিনেমায়

মরাঠি সিনেমা 'পহিলি মঙ্গলাগৌর' থেকে শুরু করে আরও প্রায় বেশ কিছু সিনেমায় এই ৪-৫ বছরের সময় পর্বে লতাকে দেখা যাবে মূলত শিশুশিল্পী হিসেবেই, যেখানে তিনি কখনও হিরোর বোন হচ্ছেন, কখনও বা হিরোইনের, কখনও গান গাইছেন নিজের চরিত্রের জন্য। তবে সংগীত যার রক্তে তাঁর কি আর অভিনয়ে বা দু'-একটা গান গেয়ে শান্তি আসে! পরে একাধিক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ''ক্যামেরার সামনে মেকআপ করে সেজেগুজে... কখনও হাসি, কখনও কান্না... একেবারেই ভাল লাগত না। সারাক্ষণ চাইতাম, কখন গান গাইতে পারব!'' বাবার মৃত্যুর পর তাঁর সংগীতচর্চা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এইসময় পর্বে লতা তাই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন বাবার শেখানো গানগুলিকেই, আর কে. এল. সায়গল ও প্রিয় শিল্পী নুর জাহানের গান শুনেই ধীরে-ধীরে তৈরি করছিলেন নিজেকে। মনে করতেন, নুর জাহানের কণ্ঠে স্বয়ং ঈশ্বরের বাস। তাই নুর জাহানের গায়কিতে মুগ্ধ হয়ে অনুকরণ করতে শুরু করেন তাঁকেই! এই সময়ের একটি ঘটনা লতার জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'প্রফুল্ল পিকচার্স'-এ তখন মাস্টার বিনায়কের পরিচালনায় 'বড়ি মা' সিনেমার শুট হচ্ছে। সেই শুটের জন্যই নুর জাহান এলেন কোলাপুরে। প্রিয় শিল্পীর সঙ্গে সেই প্রথম দেখা লতার। শোনা যায়, ১৩-১৪ বছরের কিশোরী 'খুব সুন্দর গায়' শুনে প্রথম আলাপের পরই লতাকে গান গেয়ে শোনাতে বলেছিলেন কিংবদন্তি নুর। লতার থেকে শাস্ত্রীয় সংগীত শোনার পরই তিনি বুঝেছিলেন, 'এ মেয়ের হবে!' তাই অভ্যাসে থাকার জন্য লতাকে নিয়ম করে রেওয়াজ করার পরামর্শ দেন। মাস্টার বিনায়কের প্রচেষ্টায় উস্তাদ আমান আলি খাঁ সাহেবের কাছে আবার শুরু হয় নিয়ম করে লতার শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষা।

ইন্ডাস্ট্রির 'নয়ি লড়কি'!

জীবনের প্রথম পর্বে লতা যেখানেই খানিক থিতু হতে গিয়েছেন, সেখানেই এসেছে ধাক্কা। বাবার মৃত্যুর পর যখন মাস্টার বিনায়কের চেষ্টায় খানিক আর্থিক সমৃদ্ধির মুখ দেখতে শুরু করেছেন তিনি, তখনই ১৯৪৭ সালে মাস্টারের মৃত্যু হয়। কাকতালীয়ভাবে তখনই আসে প্লেব্যাক-জগতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অভাবনীয় সুযোগ। লতার নাম ও গলা শুনে সংগীত পরিচালক হরিশচন্দ্র বলি তাঁকে কিছু কাজ দেন।



একাগ্র শ্রোতা মীনা কুমারী

"স্টুডিয়োতে আমি যখন গান রেকর্ড করছি, তখনই এক 'এক্সট্রা'র কানে যায় আমার গান, ইন্ডাস্ট্রিতে যে 'নয়ি লড়কি' এসেছে, সে খবর সংগীত পরিচালক গুলাম হায়দরকে জানাতে দেরি করেননি তিনি," জানাচ্ছেন লতা। অচিরেই ডাক আসে তাঁর, গোরেগাঁওয়ের ফিল্মিস্তান স্টুডিয়ো থেকে। গুলাম হায়দরেরই সুর করা 'হুমায়ুঁ' (১৯৪৫) সিনেমার গান সেদিন তাঁকে শুনিয়েছিলেন কিশোরী লতা। লতা-কণ্ঠের জাদুতে প্রথম শ্রবণেই এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন গুলাম, যে গান রেকর্ড করে তিনি শোনান তৎকালীন বিখ্যাত বাঙালি প্রযোজক শশধর মুখোপাধ্যায়কে। শশধরের সংস্থা তখন দিলীপ কুমার অভিনীত 'শহীদ' সিনেমার প্রযোজনা করছে। মহিলা কণ্ঠে প্লেব্যাকের জন্য চাই একজন গায়িকাকে। কিন্তু লতার গলার আওয়াজ শুনেই তাঁকে নাকচ করে দেন শশধর। গুলাম হায়দরকে জানান, 'শহীদ'-এ গানের জন্য এমন 'পাতলি আওয়াজ়' একেবারেই খাপ খাবে না! লতার এই রিজেকশন গায়ে লেগেছিল মাস্টারজির। এরপর বলিউডে লতার প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবে প্রতিষ্ঠার পিছনে গুলাম হায়দরের অবদান বিপুল। ইন্ডাস্ট্রিতে তখন লতা নবাগতা। স্টুডিয়োয় যে চা, খাবার পাওয়া যায়, এটুকুও জানতেন না তিনি! ফলে সারাদিন অভুক্ত থেকে গান রেকর্ড করেই বাড়ি ফিরে আসতেন। তরুণী লতার প্রথম পর্বের স্ট্রাগলে মাস্টার গুলাম হায়দরই হয়ে ওঠেন তাঁর 'মেন্টর'। খাঁটি হিরে চিনতে ভুল করেছিলেন শশধর, গুলাম সে ভুল করেননি। তিল-তিল করে গড়ে তোলেন নিজের আবিষ্কারটিকে। একে-একে শেখান গানের বোল, প্লেব্যাকের সাধারণ ব্যাকরণ। কোনও 'সিচুয়েশন' কল্পনা করে কীভাবে তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গাইতে হয়, লতার জীবনের প্লেব্যাকের প্রথম পর্বে এ তাঁরই শিক্ষা, যে শিক্ষাকে তাঁর দীর্ঘ সংগীতজীবনে সারাক্ষণ কাজে লাগিয়ে গিয়েছেন লতা মঙ্গেশকর, নার্গিস, মধুবালা থেকে শুরু করে হেমা মালিনী, মাধুরী দীক্ষিত, শোভনা সমর্থ থেকে শুরু করে তনুজা হয়ে কাজল... একের পর এক নায়িকার 'লিপ'-এ একাকার হয়ে গিয়েছে তাঁর সুর, কণ্ঠ। পরদার নায়িকার কাজল কালো চোখের ইশারায় সরাসরি না উপস্থিত থেকেও সেই সিচুয়েশনের সঙ্গে তাঁর কণ্ঠ হয়ে গিয়েছে সমার্থক!


দিলীপ কুমারের হাতে রাখি বাঁধছেন লতা

'আয়েগা'...

তবে লতার কেরিয়ার-জীবনের শুরুটা কিন্তু মোটেও কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। যে স্বর্গীয় আওয়াজের জন্য জগৎ-জোড়া তাঁর খ্যাতি, সেই 'পাতলি আওয়াজ'-এর জন্যই এসেছিল প্রথম রিজেকশন। তিনি মরাঠি শুনে ভুরু কুঁচকেছিলেন দিলীপ কুমার। কারণ দিলীপের ধারণা ছিল, মরাঠিদের উর্দু-হিন্দি উচ্চারণ থেকে নাকি 'ডাল-চাওয়াল'-এর গন্ধ আসে! এই প্রত্যেকটি চ্যালেঞ্জকেই হাসি মুখে গ্রহণ করেছেন তিনি। নিজেকে করে তুলেছেন আরও নিখুঁত। তাই কেরিয়ারের প্রথম দিকে তিনি শুধুই বাধ্য ছাত্রী, যে যা বলছেন, পরামর্শ দিচ্ছেন, হাসি মুখে তা গ্রহণ করছেন। দিলীপ কুমারের কথা শুনে মহম্মদ শফির সাহায্য নিয়ে মৌলবি রেখে চোস্ত উর্দু শিখছেন, উচ্চারণ ঠিক করার জন্য হিন্দি শিখছেন পেশাদার ভাবে, আবার আর এক সংগীত পরিচালক অনিল বিশ্বাসের থেকে শিখছেন কীভাবে গানের মধ্যে নিঃশব্দে শ্বাস নিতে বা ছাড়তে হয়।


গুণমুগ্ধ: উস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খান

এল ১৯৪৯ সাল। সদ্য স্বাধীন ভারত তখন এক অনিশ্চিত সম্ভাবনার দিকে ছুটছে, স্বাধীনতাত্তোর হিন্দি সিনেমার সেই কালপর্বে একের পর এক কালজয়ী সিনেমার মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রির যাত্রাপথ নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে। এমন সময়ে মুক্তি পেল নবাগত পরিচালক কমল অমরোহীর 'মহল'। অশোক কুমার-মধুবালা অভিনীত সে ছবিতে মধুবালার 'আয়েগা আনেওয়ালা'র কণ্ঠে কণ্ঠ মেলালেন আর এক নবাগতা, লতা মঙ্গেশকর। সুরের মূর্ছনায়, লতার ভয়েসের সারল্যে মাতল সদ্য বিভক্ত সমগ্র উপমহাদেশ। গানের শুরুতে ছিল দূর থেকে শোনা যাচ্ছে গান। সেটির সঙ্গত

সারল্যে মাতল সদ্য বিভক্ত সমগ্র উপমহাদেশ। গানের শুরুতে ছিল দূর থেকে শোনা যাচ্ছে গান। সেটির সঙ্গত করতে লতা নাকি গাইতে-গাইতে হেঁটে মাইক্রোফোনের কাছে আসেন। প্রায় ২০-২৫ বার 'টেক'-এর পর 'ওকে' হয় সেটি! শোনা যায়, 'আয়েগা আনেওয়ালা'র ৭৮ আরপিএম রেকর্ড যখন বের হয়, তখন ডিস্কে কেবল মধুবালা অভিনীত কামিনী চরিত্রটির কথাই লেখা ছিল। এরপর গায়িকার নাম জানার জন্য এইচএমভি-র কাছে অজস্র অনুরোধ পত্র আসতে থাকে। শেষমেশ চাপে পড়ে তারা জানাতে বাধ্য হয় যে, গায়িকা লতা মঙ্গেশকর নামে এক নব্য তরুণী! নিজের উর্দু উচ্চারণকে স্বল্প সময়েই এমন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন লতা যে, 'মহল-এ গান গাওয়ার পর বিখ্যাত গায়িকা জদ্দনবাই হুসেনও তাঁর উর্দু উচ্চারণের প্রশংসা করেছিলেন। লতার উচ্চারণ শুনে উনি যে মরাঠি, এটা জেনে অবাক হয়েছিলেন নার্গিসও!

'আয়ে দিন বাহার কে'



মহড়া: মদন মোহনের সঙ্গে

হিন্দি ছবিতে গান গাওয়ার শুরু থেকে লতার জীবনে শুধুই যেন পরিশ্রম। তবে এ পরিশ্রম কষ্টের নয়, আনন্দের। ২২-২৩ বছর বয়স তখন। একদিনেই ৬-৮ টা গান রেকর্ড করছেন। সকাল পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটায় উঠে রেওয়াজ সেরেই বেরিয়ে পড়তেন কাজে। লোকাল ট্রেনে করেই কখনও আন্ধেরি, গোরেগাঁও বা মালাড। লতা নিজেই বলেছেন, কাজ করার এমন উদগ্র বাসনা ছিল যে স্ট্রাগল যে কতটা কঠিন, সেটার আঁচ গায়ে লাগেনি। তিনিও প্রাণভরে গান গাইতে চেয়েছেন, আর সংগীত পরিচালকেরাও তাঁকে যেন ভরিয়ে দিয়েছেন। প্রথম দিকে গুলাম হায়দর থেকে শুরু করে নৌশাদ, শঙ্কর জয়কিষণ, মদনমোহন, এস. ডি. বর্মণ, সি. রামচন্দ্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, আর. ডি. বর্মণ, কল্যাণজি-আনন্দজি সব সুরকারদেরই যেন প্রথম পছন্দ একমেবাদ্বিতীয়ম লতা মঙ্গেশকর! তাঁরা তাঁদের সেরা-সেরা কম্পোজিশনগুলো রেখে দিচ্ছেন তাঁর জন্যই! পাঁচের দশকে লতা তাই প্রবল ব্যস্ত, ঝুলিতে তাঁর প্রচুর কাজ। এমনকি, একজন প্লেব্যাক সিঙ্গার তাঁর সারা জীবনে যা-যা চান, সেই সব সাফল্য সেই ৩০-এই তাঁর মুষ্ঠিগত!



'জিয়া লে গয়ো জি মোরা সাঁওয়ারিয়া'

কিন্তু কীভাবে সম্ভব হল এই অসাধ্য সাধন? শামশাদ বেগম, গীতা দত্তকে সরিয়ে কীভাবে একমাত্র তিনিই হয়ে উঠলেন সব সুরকারদের কাছের? আসলে লতা যখন 'লতা' হয়ে উঠছেন, তার বিকাশপর্বে গায়িকা-নায়িকার ব্যবধান তখনও প্রকট নয়। সুরাইয়া, নুর জাহানের মতো ডাকসাইটে প্রথম যুগের অভিনেত্রীরা নিজেরাই অভিনয় করছেন, আবার পাশাপাশি পরদার পিছনে নিজেরাই নিজেদের গানগুলি গাইছেন। ফলে প্লেব্যাক সিঙ্গারের ধারণাটি স্পষ্ট ছিল না। বলিউডের প্রথমযুগের অন্যতম প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবে শামশাদ বেগম, বা লতার খানিক আগে কেরিয়ার শুরু করা গীতা দত্তই তখন ছিলেন সুরকার-প্রযোজকদের প্রথম পছন্দ। মান্না দে একবার বলেছিলেন, "লতা যখন গাইতে শুরু করেন, তখন জোহরাবাই অম্বালেবালি ও শামশাদ বেগম সকলের গলাই যেন লতার সুরেলা, মিষ্টি গলার কাছে 'আনপলিশড' লাগতে শুরু করে। কারণ ওঁদের গলায় ছিল খানিক 'ন্যাজাল টোন', কণ্ঠস্বর বলিষ্ঠ। লতার সফিস্টিকেশন তাঁদের গলায় ছিল না। কারণ লতা 'শুন শুন কে বনি হ্যায়'। সেই শোনা কখনও নুর জাহানের থেকে, কখনও গীতা দত্তের থেকে। কিন্তু গীতার গলায় যে দুর্বলতা ছিল, লতা সেটাকেই ঠিক করে তাঁর শক্তি করে তোলেন!" ইন্ডাস্ট্রিতে কান পাতলে আজও শোনা যায় গীতা-লতা দ্বৈরথের কিসসা। শোনা যায়, প্রথম দিকে এস. ডি. বর্মণের প্রিয় ছিলেন গীতা দত্ত। তারপর লতা তাঁর জায়গা নিতে শুরু করেন। কিন্তু গীতা-লতা বন্ধু ছিলেন, একথাও সত্যি।



এস. ডি. বর্মণ, আর. ডি. বর্মণ ও লতা

ফিল্ম হিস্টোরিয়ান গৌতম চিন্তামণির কথায়, "পাঁচের দশক এমন এক সময় যখন সিনেমার মাধ্যমে ভারতের গতিপথ নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছিল। তৈরি হচ্ছিল 'আওয়ারা' (১৯৫১), 'দীদার' (১৯৫১), 'আন' (১৯৫২), 'দো বিঘা জমিন' (১৯৫৩), 'শ্রী ৪২০' (১৯৫৫), 'মধুমতী' (১৯৫৮), 'পেয়িং গেস্ট' (১৯৫৭), 'মাদার ইন্ডিয়া' (১৯৫৭)। এইসব সিনেমার সাফল্যের সঙ্গেই যেন লতার সাফল্যের গল্পও সমান্তরালে লিখে দিচ্ছিলেন অদৃশ্য বিধাতাপুরুষ।" হিসেব করলে দেখা যায়, মাত্র এই এক দশকেই তিনি ২০০ টির উপর গান গেয়েছেন।



হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক রেকর্ডিংয়ে

প্রথম যুগে প্লেব্যাক সিঙ্গাররা সেভাবে পাত্তা পেতেন না ইন্ডাস্ট্রিতে। গায়কদের রয়্যালটি পাওয়া নিয়ে রাজ কপূরের সঙ্গে ঝামেলা, মহম্মদ রফিও সমর্থন করেন রাজ কপূরের যুক্তি। কিন্তু বেঁকে বসেন লতা। লড়াই করে প্রতিষ্ঠা করেন দাবি। ১৯৫৯-র আগে অ্যাওয়ার্ড শোতে প্লেব্যাক সিঙ্গারদের আলাদা ক্যাটেগরি হয়নি বলে গান গাইতে অরাজি ছিলেন তিনি। এস ডি বর্মণ একবার বলেন, সঙ্গীত পরিচালকরাই নাকি লতার কেরিয়ার তৈরি করেছিলেন। কথাটা লতার মানে লেগেছিল। এরপর তাঁরা প্রায় ছয় বছর কাজ করেননি। পরে আর. ডি.-র মধ্যস্থতায় আবার সম্পর্ক ঠিক হয়। লতা আবার এসডি-র জন্য গান করতে শুরু করেন।



সুরসাধিকা

আদতে ভিতরে অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও, অনেক গল্প থাকলেও স্টুডিয়োর বাইরে সাদা শাড়ি, সিঁথি কাটা চুলের স্টাইল আর মিনিমাম গয়না নিয়ে সাদাসিধে লতা নিজের এমন ইমেজ ক্রিয়েট করেছিলেন, যেখানে গসিপ ছিল না। বরং ইন্ডাস্ট্রির বড়-বড় লোকেদের রাখি পরানো ছিল। সমসাময়িকদের সঙ্গে অলিখিত প্রতিযোগিতা থাকলেও লতার স্ট্রাগল প্রমাণ করে দেয়, ডেডিকেশন-এর কোনও বিকল্প হয় না। আর এই জন্যই সকলের কাছের হয়ে উঠতে পেরেছেন তিনি, ছোট-বড় সকলের থেকেই আদায় করে নিতে পেরেছেন শ্রদ্ধা, সম্মান। হয়ে উঠতে পেরেছেন ভারতীয় উপমহাদেশের 'জীবন্ত সরস্বতী'!

...আওয়াজ় হি পহেচান হ্যায়

লতা মঙ্গেশকর

সায়নী দাশশর্মা।



কলকাতার একটি স্টেজ শো-তে সুরের সম্রাজ্ঞী

লতা মঙ্গেশকর। *তাঁর বিনয়ী ব্যক্তিত্ব, সুরের উপর দখল, অসামান্য গায়নভঙ্গী আর স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর প্রায় আট দশক ধরে শ্রোতাদের মোহিত করেছে। পেশাজীবনের এই সুদীর্ঘ ব্যপ্তি যেমন সম্মানের শিরোভুষণে ভুষিত করেছে 'কোকিলকণ্ঠী'-কে, তেমনই অজস্র ঘাত-প্রতিঘাতেরও সম্মুখীন করেছে। কিংবদন্তির সংগীতজীবনের অ্যালবাম ঘেঁটে দেখলেন সায়নী দাশশর্মা।*



গীতা দত্ত এবং মদনমোহনের সঙ্গে রেকর্ডিংয়ে

শিল্পীর পরিচয় তাঁর শিল্পে। আর তাই শিল্পীর মৃত্যু হলেও তিনি বেঁচে থাকেন তাঁর শিল্পের মধ্য দিয়ে। কিন্তু শিল্পই যাঁর ধ্যান-জ্ঞান-সাধনা, যাঁর কণ্ঠে স্বয়ং ঈশ্বরের বাস, তাঁকে শুধুই শিল্পী বললে সত্যিই কম বলা হয়। বরং বলা ভাল, শিল্পের পরিচয় তাঁর পরিচয়ে। তিনি সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর। আসমুদ্রহিমাচল যাঁর কণ্ঠস্বরে সম্মোহিত থেকেছে প্রায় এক শতাব্দী ধরে, যাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অদ্বিতীয়, আগামী কয়েক শতকেও যে প্রতিভার ব্যাখ্যা খুঁজে পাবে না এই উপমহাদেশ... লতা মঙ্গেশকর সেই বিস্ময়ের নাম। সত্যিই বিস্ময়, কারণ এত নিঁখুত স্বরক্ষেপণ, কণ্ঠের এত মসৃণ ওঠানামা, শব্দের এত অনায়াসে জীবন্ত হয়ে ওঠা যে কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব, তিনি না থাকলে এই সত্যিটা বিশ্বের কাছে অজানাই থেকে যেত হয়তো। প্রতিটা শব্দ, প্রতিটা সুর, তাল, লয় লতার কণ্ঠস্বরে যে রূপ পেয়েছে, তাঁর অসামান্য গায়কীতে প্রতিটা গান যে মাত্রা পেয়েছে, তা তুলনাহীন। কিন্তু এই বিপুল সম্মান, এই স্বীকৃতি রাতারাতি পাননি লতা। এর নেপথ্যে এক দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে, যার সম্পূর্ণ নাগাল পাওয়া আমাদের দুঃসাধ্য! কিংবদন্তি একাধিক সাক্ষাৎকারে সেই কঠিন লড়াইয়ের আভাস দিয়েছেন যদিও... "লতা মঙ্গেশকর কি জো তকলিফে হ্যায়, উও উসিকো পতা হ্যায়"।



পরজন্ম চাননি তিনি। চাননি আবার লতা মঙ্গেশকর হয়ে জন্ম নিতে। ওই একটি কথাতেই কিংবদন্তি বুঝিয়ে দিয়েছেন, জীবনে কত লড়াই, কত সংগ্রাম থাকলে এত সাফল্য, এত শ্রদ্ধা, এত ভালবাসা সত্ত্বেও একথা বলা যায়! চেয়েছিলেন ধ্রুপদী সংগীতে নিজের পরিচয় গড়ে তুলতে। সাংসারিক দায়িত্ব আর পরিবারের প্রতি কর্তব্য তাতে বাধ সাধল। সেই আক্ষেপের ভার আমৃত্যু বহন করেছেন তিনি। প্লেব্যাক শিল্পী হিসেবে পরিচিতি পেলেন, কিন্তু প্রতি পদে প্রতিকূলতা ঘিরে ধরল তাঁকে। কুৎসা, কালিমা, বিতর্ক, কোনওকিছুই অবশ্য তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করতে পারেনি। লতা অটল থেকেছেন তাঁর সাধনায়। আপামর জনসাধারণের কাছে লতা মঙ্গেশকরের যে সাফল্য, তা তো স্রেফ হিমবাহের উপরটুকু। অতল সমুদ্রে আরও কতখানি বরফ ডুবে ছিল, তা আর ক'জনই বা জানতে পেরেছেন...

গম কা খাজ্বানা



প্রিয় সুরকার মদনমোহনের সঙ্গে

১৯৬০ সাল। প্লেব্যাক শিল্পী হিসেবে তখন লতা বেশ জনপ্রিয়। বেশ কিছু পুরস্কার জিতেছেন। সুরকার-গীতিকার সকলেরই পছন্দের তালিকার শীর্ষে তাঁর নাম। এমন সময় মুক্তি পেল 'মুঘল-এ-আজ়ম'। নওশাদের সুরে মধুবালার কণ্ঠে সর্বকালের অন্যতম সেরা পারফরম্যান্স দিলেন তিনি, 'পেয়ার কিয়া তো ডরনা কেয়া'। একই বছর শ্রোতারা শুনতে পেলেন শঙ্কর-জয়কিষণের সুরে মীনা কুমারীর ঠোঁটে 'আজীব দাস্তাঁ হ্যায় ইয়ে...' (দিল অপনা অর প্রীত পরায়ি)। দু'টি গানই রাতারাতি হিট! গোটা দেশ একইসঙ্গে আপ্লুত এবং অভিভূত। শুধু রুপোলি পর্দার নায়িকাদের দেখে নয়, নেপথ্যের কণ্ঠস্বরের মোহও তখন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে শ্রোতাদের। স্বীকৃতি বলতে এইটুকুই। কারণ তখনও প্লেব্যাক শিল্পীদের রয়্যালটির ব্যবস্থা ছিল না। প্রযোজকদের প্রশ্ন করলেন লতা। মিউজ়িশিয়ানরা রয়্যালটি পেলে শিল্পীরা পাবেন না কেন? একটা মাত্র প্রশ্নে বলিউডের সংগীতজগৎ দুই শিবিরে বিভক্ত প্রায়। একদিকে লতা, মুকেশ, তালাত মেহমুদ, অন্যদিকে প্রযোজক, সংগীত সংস্থারা। সেই সময় বিনোদন জগতে মহিলা মানেই ক্ষণস্থায়ী, তা সে অভিনয় হোক বা গান। সামান্য উনিশ-বিশ হলেই কাজ হারানোর ভয়। ওদিকে লতা তখন সদ্য পরিচিতি পেয়েছেন। তবুও তাঁকে দমানো গেল না। ১৯৬১-তে তখন 'মায়া' মুক্তি পেয়েছে সদ্য। মহম্মদ রফির সঙ্গে দ্বৈতসংগীতে লতার জনপ্রিয় গান 'তসবির তেরে দিল মে'। দ্বৈতসংগীতে লতা-রফি জুটির জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া। 'শুন মেরে সাজনা রে', 'ধীরে ধীরে চল'-এর মতো অসামান্য কম্পোজ়িশন লোকের মুখে মুখে। কিন্তু 'পিপল-প্লিজ়ার' মহম্মদ রফি প্রযোজকদেরই পক্ষ নিলেন। তাঁর মত ছিল, একজন কম্পোজ়ার কোনও শিল্পীকে গান গাওয়ানোর পর যে পারিশ্রমিক দিচ্ছেন, সেটুকুই শিল্পীর প্রাপ্য। এরপর রয়্যালটি নেওয়া মানে শিল্পের অবমাননা করা। বিবাদ এত উঁচুতে উঠল যে সকলের সামনে রফি বলে বসলেন তিনি লতার সঙ্গে আর কোনও গান গাইবেন না। ন্যায্য অধিকারের লড়াইয়ে নেমে দমে যাওয়ার পাত্রী ছিলেন না লতাও। প্রত্যুত্তরে তিনিও বলে দেন, রফি নন, বরং তিনিই গাইবেন না তাঁর সঙ্গে। মহম্মদ রফির সঙ্গে দ্বৈত সংগীতের জন্য যেন অন্য শিল্পীকে খুঁজে নেওয়া হয়! শোনা যায়, সেই সময় বোন আশা ভোঁসলেও মহম্মদ রফির পক্ষ নেন। লতার পাশে দাঁড়ান একমাত্র কিশোর কুমার। এরপর প্রায় চার বছর (১৯৬৩-১৯৬৭) একসঙ্গে কাজ করেননি লতা মঙ্গেশকর এবং মহম্মদ রফি। পরে সুরকার জয়কিষণের মধ্যস্থতায় চিঠি লিখে লতার কাছে ক্ষমা চান রফি। যদিও শেষমেশ বরফ গলে শচীন দেব বর্মণের মাধ্যমে। 'এস ডি বর্মণ নাইট'-এ একই মঞ্চে 'দিল পুকারে'-তে আবার গলা মেলালেন লতা-রফি। রয়্যালটির লড়াইতেও শেষ পর্যন্ত জয়ী হন লতাই।



এরই মধ্যে আর-এক জীবন-মৃত্যু সংগ্রামের মুখোমুখি হন কোকিলকণ্ঠী। ১৯৬২ সাল নাগাদ হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন লতা। অজানা কারণে রাতারাতি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। এক্স-রে করে পাকস্থলীতে বিষ পাওয়া যায়। জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে বিষক্রিয়া হয়েছে তাঁর শরীরে। টানা তিনদিন জীবন-মরণ লড়াইয়ের পর বিপদমুক্ত হন তিনি। প্রায় ১০দিন বাদে অবস্থার উন্নতি হয়। কে বা কারা তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন, তা জানা না গেলেও, ওই ঘটনার পরই পারিশ্রমিক না নিয়েই আকস্মিকভাবে কাজ ছেড়ে দেন তাঁর রাঁধুনি। বিষপ্রয়োগের খবর পাওয়ার পর টানা বেশ কিছু দিন সন্ধেবেলায় তাঁর বাড়িতে যেতেন বিখ্যাত গীতিকার মজরুহ সুলতানপুরি। গায়িকার সঙ্গে নিয়মিত সময় কাটাতেন তিনি। লতাকে দেওয়া সুপ আগে নিজে চেখে তারপরে খেতে দিতেন তাঁকে। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পরও প্রায় তিনমাস কোনও রেকর্ডিং করেননি সুরসম্রাজ্ঞী। বহুদিন পর্যন্ত গরম খাবার খেতে পারতেন না। সুস্থ হওয়ার পর প্রথম গাইলেন, 'কহিঁ দীপ জ্বলে, কহিঁ দিল', হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের (হেমন্ত কুমার) সুরে। আবার সুপারহিট! বছরের সেরা গান হিসেবে সেই বছর জীবনের দ্বিতীয় ফিল্মফেয়ার পুরস্কার জেতেন শিল্পী।

প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে



শচীন দেব বর্মণের সঙ্গে

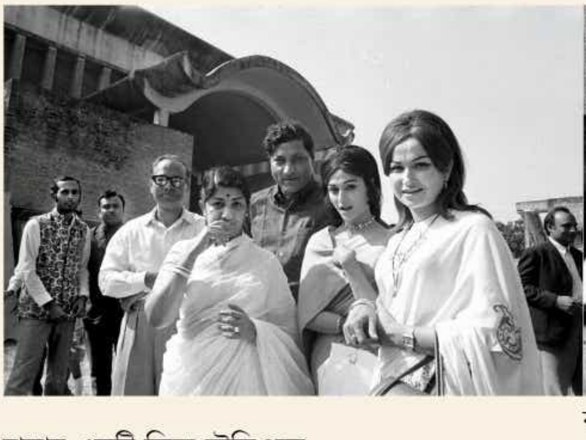


অনিল বিশ্বাসের সঙ্গে

১৯৪২ থেকে ২০১৯, লতা মঙ্গেশকরের আট দশকের পেশাজীবনের ব্যাপ্তিতে মিশে রয়েছে কয়েক প্রজন্মের ওঠাপড়া। তৎকালীন তো বটেই, এমনকী আধুনিক সংগীত জগতেও এমন সুরকার নেই, যাঁর সুরে সুর তোলেননি তিনি (একমাত্র ও.পি.নাইয়ার ছাড়া), এমন কোনও গীতিকার নেই, যাঁর লেখনি তাঁর গায়কীতে চিরস্মরণীয় হয়ে ওঠেনি, এমন কোনও শিল্পী নেই, যাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মেলাননি লতা। ৩৬টি ভাষায় প্রায় ৫০ হাজার (মতান্তরে তারও বেশি) গান গেয়েছেন তিনি, সংগীতের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আজও অপ্রতিম। অনিল বিশ্বাস, শঙ্কর-জয়কিষণ, শচীন দেব বর্মণ, সি. রামচন্দ্র, সলিল চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, খৈয়ম, কল্যাণজি-আনন্দজি, মদনমোহন, আর. ডি. বর্মণ থেকে শুরু করে পরবর্তীতে বাপি লাহিড়ী, বিশাল ভরদ্বাজ, বিজয় পাটিল, যতীন-ললিত, এ. আর. রহমান সকলের সঙ্গেই কাজ করেছেন সুরসম্রাজ্ঞী। দ্বৈত সংগীতে জুটি বেঁধেছেন মহম্মদ রফি, কিশোর কুমার, মুকেশ, মান্না দে থেকে কুমার শানু, উদিত নারায়ণ, সোনু নিগম, অভিজিৎ, হরিহরণ, এস পি বালাসুব্রহ্মণ্যমের মতো শিল্পীদের সঙ্গে। তাঁর প্রথম ফিল্মফেয়ার পুরস্কার সলিল চৌধুরীর কম্পোজিশনে, মধুমতী (১৯৫৮) ছবির 'আ জা রে, পরদেসি' গানে। ততদিনে অবশ্য বাংলা সংগীতেও নিজের ছাপ তৈরি করে ফেলেছেন লতা। হিন্দির পর তার সবচেয়ে বেশি গান তো বাংলা ভাষাতেই। তাছাড়া তৎকালীন বলিউডে বাঙালিদের প্রভাবও তো কম ছিল না! সেই সূত্র ধরেই লতার বাংলা সংগীতে পদার্পণ। সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কম্পোজিশনে 'আকাশ প্রদীপ জ্বলে' দিয়ে যাত্রা শুরু। তারপর সলিল চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো সুরকারদের কালজয়ী বহু কম্পোজিশনে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেন সুরসম্রাজ্ঞী। ছয়ের দশকে তাঁর সঙ্গে জুটি বাঁধেন লক্ষ্মীকান্ত-প্যায়ারেলাল। কোকিলকণ্ঠী তাঁর সমগ্র কেরিয়ারে সর্বোচ্চ সংখ্যক গান এই সুরকার-জুটির

বাঁধেন লক্ষ্মীকান্ত-প্যায়ারেলাল। কোকিলকণ্ঠী তাঁর সমগ্র কেরিয়ারে সর্বোচ্চ সংখ্যক গান এই সুরকার-জুটির সঙ্গেই গেয়েছেন (প্রায় ৭০০)। ১৯৫৭ নাগাদ শচীন দেব বর্মণের কিছু কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গে কাজ করা বন্ধ করে দেন লতা। কিন্তু ১৯৬১-তে যখন রাহুল দেব বর্মণ প্রথম স্বাধীনভাবে কাজ করা শুরু করেন, হাসিমুখে এগিয়ে এসেছিলেন তিনি। তাঁর কণ্ঠ দিয়ে সংগীত জীবন শুরু করেন আর. ডি. বর্মণ। পরে ১৯৬৩-তে রাহুল দেব বর্মণের মধ্যস্থতায় আবার শচীন দেব বর্মণের সঙ্গে জুটি বাঁধেন লতা, 'মোরা গোরা অঙ্গ লই লে' (বন্দিনী) -তে। সেটি গুলজারেরও প্রথম গান ছিল। মজা করে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, "মেরা উও এক গানা দো সমঝোতো কি ওয়াজা বন গয়ি।" এরপর 'আজ ফির জিনে কি তমন্না হ্যায়', 'গাতা রহে মেরা দিল', 'হোঁঠো পে অ্যায়সি বাত', 'পিয়া তোসে নয়না লাগে'-র মতো একের পর এক অসামান্য গানের সাক্ষী থেকেছে আসমুদ্রহিমাচল। এছাড়া মদনমোহনের সুরে 'আপকি নজরো নে সমঝা', 'রুকে রুকে সে কদম', 'লগ জা গলে', 'তু যাঁহা যাঁহা চলেগা', 'তেরি আখোঁ কে সিওয়া', গুলাম মহম্মদের সুরে 'চলতে চলতে', 'ইনহি লোগো নে', হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে 'বন্দে মাতরম', 'কুছ দিল নে কাহা', 'মন ডোলে মেরা', 'শুন রি সখি', শঙ্কর-জয়কিষণের সঙ্গে 'বরসাত মেঁ হামসে মিলে', 'হাওয়া মে উড়তা যায়ে', কল্যাণজি-আনন্দজির সুরে 'বেখুদি মে সনম', 'রুঠে রুঠে পিয়া', লক্ষ্মীকান্ত-প্যায়ারেলালের সঙ্গে 'মেরা মেহবুব', 'আ জানে জা', 'সীসা হো ইয়া দিল হো', আর.ডি. বর্মণের সঙ্গে 'রয়না বিতি যায়', 'বিতি না বিতায়ি রয়না', 'কিতনা প্যায়ারা ওয়াদা হ্যায়', 'তুম আ গয়ে হো', 'সাওয়ান কে ঝুলে', 'চড়তি জওয়ানি মেরি', 'তেরে বিনা জিন্দেগি সে কোয়ি', 'কেয়া ইয়েহি প্যায়ার হ্যায়', 'অগর তুম না হোতে', 'তুঝসে নারাজ নহি', ভূপেন হাজারিকার সুরে 'দিল হুম হুম করে', রাজেশ রোশনের সুরে 'ওয়াদা না তোড়', 'আঁখিয়ো হি আঁখিয়ো মে', বাপি লাহিড়ীর সঙ্গে 'গোরি হ্যায় কলাইয়া', 'যব সে মিলে নয়না', শিব-হরির সুরে 'মোরনি বাগামা বোলে', 'আঁধি রাত কো', 'ইয়ে কাহাঁ আ গয়ে হাম', রাম লক্ষ্মণের সুরে 'দিদি তেরা দেওয়র দিওয়ানা', 'ইয়ে মৌসম কা জাদু হ্যায়', যতীন-ললিতের সুরে 'মেরে খোয়াবো মে', 'তুঝে দেখা তো ইয়ে', এ. আর. রহমানের সুরে 'জিয়া জ্বলে', 'ও পালানহারে', 'লুকা ছুপি' তাঁর সর্বকালের সেরা গানের মধ্যে অন্যতম। ২০১৯-এ তাঁর শেষ গান রেকর্ড করেন শিল্পী, 'সৌগন্ধ মুঝে ইস মিট্টি কি'।
কাকতালীয়ভাবে, রাহুল দেব বর্মণের প্রথম (ছোটে নওয়াব) এবং শেষ ছবি, (১৯৪২ আ লাভ স্টোরি), দু'টির জনপ্রিয় গানই লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে। এছাড়াও অসংখ্য সুরকার, গীতিকার, শিল্পী কেরিয়ার শুরু করেছেন তাঁর গান দিয়ে। শোভনা সামর্থ, তনুজা এবং কাজল, তিন প্রজন্মই লতার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে ঠোঁট মিলিয়েছেন। আসলে এক জীবনে তিনি যা দিয়ে গিয়েছেন তার মর্ম বুঝতে হয়তো আরও কয়েক প্রজন্ম সময় লাগবে। তিনি নিজের মধ্যেই এক প্রতিষ্ঠান, এক অন্তহীন ইতিহাসের সাক্ষী, সংগীত জগতের মহীরুহ। আর তাই আট দশক আগে সংগীত জীবনের শুরুতেও লতা মঙ্গেশকর যতটা প্রাসঙ্গিক ছিলেন, এখনও ততটাই রয়ে গিয়েছেন। ভাবী প্রজন্মেও যে থাকবেন, তাও নিঃসংশয়।

অপরাজেয়, অপ্রতিরোধ্য, অনুপম



ঢাকায় একটি ফিল্ম স্টুডিওতে



রাজ কপূর এবং রবীন্দ্র জৈনের সঙ্গে 'রাম তেরি গঙ্গা ময়লি'-র রিহার্সালে

সংগীতশিল্পী হিসেবে তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। চারের দশক থেকে নব্বইয়ের শেষ পর্যন্ত সংগীত জগতে প্রায় একাই রাজত্ব করে গিয়েছেন লতা মঙ্গেশকর। প্রতিভা যে আর আসেনি, তা নয়। কিন্তু 'লতা মঙ্গেশকর' একজনই ছিলেন। মহিলা হিসেবে তো বটেই, এমনকী পুরুষ-প্রধান ইন্ডাস্ট্রিতেও যেভাবে নিজের জায়গা ধরে রেখেছিলেন তিনি, তা সত্যিই শিক্ষণীয়। কিন্তু এই পরিচয়ের বাইরে সভ্যতা আলাদা করে তাঁকে মনে রাখবে তাঁর বিনয়ী, সদাহাস্য ব্যক্তিত্ব এবং চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য। প্রচণ্ড ডিসিপ্লিনড ছিলেন লতা, তাঁর যাপন থেকে অনেককিছুই শেখার রয়েছে। শিল্পী হিসেবে উচ্চতা ছিল আকাশছোঁয়া, তবে পা বরাবরই মাটিতে ছিল। সমবয়স্ক সুরকার, গীতিকার, সকলকেই সমান শ্রদ্ধা দিয়েছেন বরাবর। মাত্র দেড় মাসের ছোট ছিলেন কিশোর কুমারের চেয়ে। তবুও আজীবন 'কিশোরদাদা' সম্বোধন করে গিয়েছেন তাঁকে। আবার সেই সম্মান ফিরেও পেয়েছেন, হয়ে উঠেছেন সকলের 'লতা দিদি'। বলিউডের চাকচিক্য, জৌলুসে কোনওদিনই স্বচ্ছন্দ ছিলেন না। সেই দূরত্বও আমৃত্যু বজায় রেখে গিয়েছেন। অবশ্য এই বিনম্র, ঘরোয়া, আটপৌরে অবয়বটির পিছনে এক ইস্পাত-কঠিন মানুষও ছিলেন, নানা ঘটনায় যাঁর পরিচয় পেয়েছে সংগীতজগৎ। তা সে রয়্যালটি ঘিরে প্রযোজকদের সঙ্গে বিতর্কই হোক, শচীন দেব বর্মণের কথায় অপমানিত হয়ে সাময়িক সম্পর্কচ্ছেদই হোক বা ১৯৫৯ সালে ফিল্মফেয়ার কর্তৃপক্ষকে দিয়ে প্লেব্যাক সিংগারদের জন্য আলাদা বিভাগ শুরু করার ব্যবস্থাই হোক, শিল্পীদের যোগ্য মর্যাদা পাওয়ানোর জন্য আজীবন লড়াই করে গিয়েছেন তিনি। একাধিকবার গান ফিরিয়ে দিয়েছেন, তার কথায় আপত্তিকর শব্দের প্রয়োগ রয়েছে বলে। শুধু গান নয়, শোনা যায় একবার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পুরস্কারস্বরূপ নগ্ন নারীর অবয়ব থাকায়, তা-ও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন লতা মঙ্গেশকর। এ বিষয়ে বরাবরই নিজ সিদ্ধান্তে অটল থেকেছেন সুরসম্রাজ্ঞী। নিজমত প্রকাশে কখনও এতটুকু কুণ্ঠা করেননি, বিপরীতে রাজ কপূরের মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব থাকলেও নয়...



মিউজিক অ্যালবাম লঞ্চে রেখার সঙ্গে

এমনিতে রাজ কপূর বরাবরই ভীষণ ভক্ত ছিলেন লতার গায়কীর। যদিও শোনা যায়, প্রথমদিকে লতার গান শুনে নাকি সুরকার জয়কিষণকে সাবধান করেছিলেন রাজ কপূর। ধ্রুপদী ঘরানার সংগীতে প্রশিক্ষণ থাকা সত্ত্বেও বাণিজ্যিক ছবির গানে এত সাবলীলতাকে ভাল চোখে দেখেননি তিনি। পরে অবশ্য তাঁর গায়নভঙ্গিতে মুগ্ধও হয়েছিলেন অভিনেতা-পরিচালক। নিজের একাধিক ছবিতে গানও গাইয়েছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি বরাবরই খামখেয়ালি স্বভাবের। গানের সুর, গায়কী বা কথা পছন্দ না হলে সুরকার, গীতিকার, শিল্পী কাউকেই ছাড়তেন না। ইচ্ছেমতো বদলে দিতেন সবকিছু, যখন তখন। রাজ কপূরের এই স্বভাব একেবারেই পছন্দ করতেন না লতা। এ নিয়ে মনে নানা অসন্তোষ থাকলেও সর্বসমক্ষে কখনও প্রকাশ করেননি সেকথা। সুসম্পর্কই বজায় রেখে গিয়েছেন বরাবর। কিন্তু বিবাদ চরমে ওঠে 'সত্যম শিবম সুন্দরম'-এর সময়। রাজ কপূর মূলত লতাকে স্মরণে রেখেই কাহিনি তৈরি করেছিলেন। গল্পের নায়িকা অসামান্য গায়িকা ছিলেন, কিন্তু তাঁর বাহ্যিক রূপ ছিল না। রাজ কপূর-দুহিতা ঋতু নন্দ অভিনেতা-পরিচালকের জীবনীতে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, প্রথমে অভিনয়ে সম্মতি জানিয়েও পুরো কাহিনি শোনার পর নাকি অসন্তুষ্ট হয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন লতা। গান গাইতেও অস্বীকার করেন। তাই নিয়েই তিক্ততা বাড়ে পরিচালক এবং শিল্পীর। যদিও অবশেষে লতাকে গান গাইতে রাজি করাতে সফল হন পরিচালক। আর শ্রোতারাও উপহার পান আরও একটি কালজয়ী কম্পোজিশন!



হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে

সংগীতের আরাধনা করতেন লতা মঙ্গেশকর। চেয়েছিলেন একমাত্র কণ্ঠস্বর দ্বারা পরিচিত হতে। শত কুৎসা, বিতর্কও তাঁর সেই সাধনা ভঙ্গ করতে ব্যর্থ হয়েছে বরাবর। নয়ের দশকে, যখন তাঁর সমসাময়িক সুরকার-গীতিকারদের কেউই প্রায় নেই, তখনও একটানা নায়িকাদের ঠোঁটে কণ্ঠ দিয়েছেন কিংবদন্তি। তাঁর সময় পাওয়ার অপেক্ষায় মাসখানেক অবধি বসে থাকতেন সংগীত পরিচালক, সুরকার, গীতিকাররা, একটি সাক্ষাৎকারে একবার নিজেই সেকথা বলেছিলেন তিনি। বলাই বাহুল্য, বিষয়টা সকলে সমান চোখে দেখতেন না। বহু সংবাদমাধ্যমে সেই খবর প্রকাশ পেয়েছিল 'মঙ্গেশকর মোনোপলি' হিসেবে। সংগীত জগতে তাঁর প্রভুত্ব, একচেটিয়া রাজত্ব, নতুনদের সুযোগ দিতে না চাওয়া ঘিরে তৈরি হয়েছিল নানা বিতর্ক। অথচ এই লতাই একাধিকবার পরিচালকদের

গান গাওয়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন অন্য শিল্পীদের দিয়ে, তা সে বোন আশা ভোঁসলেকে দিয়েই হোক বা সুমন কল্যাণপুরের মতো সংগীতশিল্পীকে দিয়ে। পক্ষপাতিত্বের ধারকাছও ঘেঁষেননি কোনওদিন। ভাই-বোনেরা একই ইন্ডাস্ট্রির অংশ ছিলেন, কিন্তু স্বজনপোষণের কালিমা কোনওদিনও লাগতে দেননি নিজের গায়ে। ইন্ডাস্ট্রিতে প্রতিদ্বন্দ্বী কিন্তু কম ছিল না। শুরুর দিকে জোহরাবাঈ, শামশাদ বেগম, গীতা দত্ত, পরবর্তীকালে আশা ভোঁসলে, তারও পরে অনুরাধা পড়ওয়াল, অলকা ইয়াগনিক.... কিন্তু তিনি অপরাজেয়ই থাকলেন। শোনা যায়, গীতা দত্ত একবার শচীন দেব বর্মণের কাছে অনুযোগ করেছিলেন, কেন তাঁকে ছেড়ে লতাকে দিয়ে গান গাওয়াচ্ছেন তিনি। উত্তরে সুরকার বলেছিলেন, "লতা লতাই।" এই দিক থেকে তিনি বরাবরই অদ্বিতীয়।



একটি অনুষ্ঠানে শচীন তেণ্ডুলকর, অমিতাভ বচ্চন এবং বাল ঠাকরের সঙ্গে লতা

অন্য লতা

সংগীত বরাবরই তাঁর প্রধান ধ্যান-জ্ঞান-তপস্যা ছিল। তবে ভালবাসতেন অনেককিছুই। ছবি তোলার শখ ছিল লতার। একাধিক প্রফেশনাল ক্যামেরার সংগ্রহ ছিল তাঁর কাছে। যেখানেই যেতেন সঙ্গে থাকত তাঁর প্রিয় রোলিফ্লেক্স ক্যামেরা। এই প্রসঙ্গে একবার একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "আমার সমস্ত ছবি দেখতে হলে মাস না হলেও সপ্তাহখানেক লেগেই যাবে।" ফোটোগ্রাফি ছাড়াও গয়নার প্রতি দুর্বলতা ছিল তাঁর। বিশেষত হিরে তাঁর অন্যতম পছন্দের রত্ন। চকোলেট খেতে ভালবাসতেন। লাস ভেগাসের ক্যাসিনোয় যেতেন নিয়মিত, স্লট মেশিন তাঁর অন্যতম পছন্দের খেলা। আর লতা মঙ্গেশকরের ক্রিকেটপ্রেমের কথা কে না জানেন!

ভার্সেটালিটির সর্বোত্তম সংজ্ঞা



রাহুল দেব বর্মণের সঙ্গে



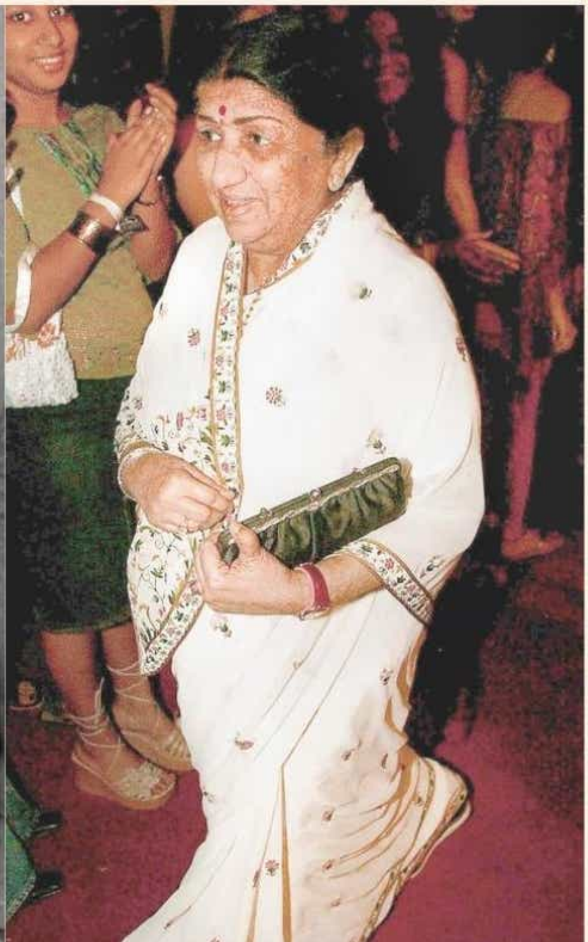
বেদ পালের সঙ্গে লতা

একথা অনেকের মুখেই শোনা গিয়েছে যে, ঠিক সুরে বা ঠিক কথায় হয়তো অনেকেই গান গাইতে পারেন, কিন্তু লতা মঙ্গেশকরের মতো সুরের উপর দখল, গায়নভঙ্গি, শব্দের মধ্য দিয়ে গানের রং-রূপ-রস অনুধাবন করার মতো পারদর্শিতা সকলের থাকে না। যদিও প্রথম থেকে এই পারদর্শিতা ছিল না লতার। অনেকটাই শিখেছেন সংগীত জীবন শুরু করার পর। যখন যে ভাষায় গেয়েছেন, আগে সেই ভাষা রপ্ত করেছেন। শোনা যায়, গানের প্রতিটা শব্দের পুঙ্খানুপুঙ্খ অর্থ জেনে তবে তিনি গান গাইতেন। গানের ভাষা যাই হোক, মরাঠিতে প্রতিটা অক্ষর

লেখার অভ্যেস ছিল, আজীবন। কোথায় জোর দিতে হবে, কোথায় গলা কাঁপাতে হবে, তা-ও লিখে রাখতেন। লেখার ফাঁকে ফাঁকে সুর তুলতেন। এ বিষয়ে বরাবরই ভীষণ খুঁতখুতে ছিলেন কিংবদন্তি। এমনও শোনা গিয়েছে যে, সকালে রেকর্ডিং শুরু করে রাতে বাড়ি ফিরেছেন, স্রেফ তাঁর নিজের গান পছন্দ হচ্ছে না বলে! কোথায় কতটা আবেগ দিতে হবে, কতটা প্রাণ ঢালতে হবে, তার নিঁখুত পরিমাপ ছিল তাঁর নখদর্পণে। শুধু পারফেকশনিস্টই ছিলেন না, ভার্সেটাইলিটিরও সমার্থক ছিলেন সর্বার্থে। প্লেব্যাকের পাশাপাশি অজস্র ভজন, গজল, লোকসংগীত, দেশাত্মবোধক, রাগাশ্রয়ী গানে নিজের জাত চিনিয়েছেন তিনি। চিরন্তন প্রেমের গানে গলায় যে রোম্যান্টিসিজমের আবেশ ছড়িয়েছেন, 'আ জানে যা'-তে ততটাই আবেদনের আভাস পাওয়া গিয়েছে তাঁর কণ্ঠস্বরে। 'সত্যম শিবম সুন্দরম'-এ জিনাত আমানের শৈশবের দৃশ্যে গলায় যতখানি শিশুসুলভ সারল্য, যৌবনের গায়কি ততটাই পরিণত। আবার 'লুকা ছুপি'-তে তাঁর কণ্ঠে সদ্য সন্তান হারানোর আকুল আর্তি। যখন যাঁর জন্য গান গেয়েছেন, তাঁর চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন। এই ভার্সেটাইলিটিই কিংবদন্তির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এক অদ্ভুত পরিমিতিবোধ, যা সংগীতের উপর প্রকৃত দখল না থাকলে আসে না, খুঁজে পাওয়া যেত লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে। এমনকী গায়নভঙ্গি দিয়ে গানের লিঙ্গও নাকি বদলে ফেলতে পারতেন তিনি! 'হমনে দেখি হ্যায় উন আঁখো কি মহেকতি খুশবু' গানটির প্রসঙ্গে গুলজার একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "গানটা একজন পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লিখেছিলাম। কিন্তু লতাজি গাইবেন শুনে, আমি আপত্তি জানাই। অথচ ওঁর গলায় গানটা রেকর্ড করার পর দেখলাম এতটুকু বেমানান লাগছে না। গানের উপর এতটাই দখল ছিল ওঁর।" ১৯৪৯-এ ২০ বছরের লতার কণ্ঠস্বরে 'আয়েগা আনেওয়ালা' যতটা মর্মস্পর্শী, ৭৫ বছরে 'হম তো ভাই য্যায়সে হ্যায়'-তেও ততটাই শ্রুতিমধুর। মধুবালা, মীনা কুমারি থেকে মাধুরী দীক্ষিত, ঐশ্বর্য রাই, প্রতিটি দশকেই নায়িকাদের সিগনেচার সং তাঁর স্বরে। সরস্বতীর বরপুত্রী ছিলেন লতা। প্রকৃত অর্থেই তাঁর কণ্ঠে ঈশ্বর বাস করতেন। না হলে, এত দীর্ঘ সময় স্বরের তারুণ্য ধরে রাখাও কি সম্ভব?



সুরের সম্রাজ্ঞী



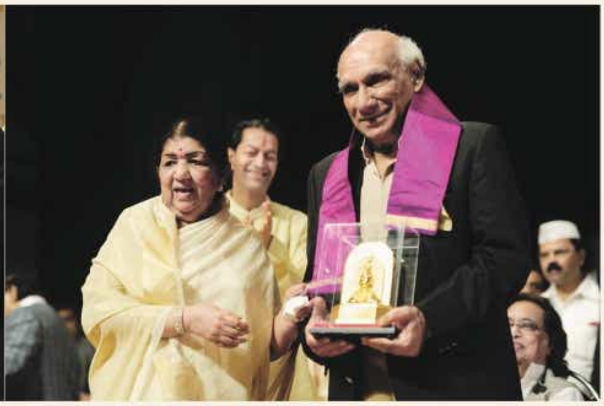
একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে

ভার্সেটাইলিটির কথা প্রসঙ্গে, প্রযোজক এবং সংগীত পরিচালক লতা মঙ্গেশকরের কথাও না বললেই নয়। ১৯৫৩ থেকে ১৯৯০-এর মধ্যে চারটি ছবি প্রযোজনা করেছেন কোকিলকণ্ঠী। ১৯৫৫-এ মরাঠি ছবি 'রাম রাম পভানে'

থেকে ১৯৯০-এর মধ্যে চারটি ছবি প্রযোজনা করেছেন কোকিলকণ্ঠী। ১৯৫৫-এ মরাঠি ছবি 'রাম রাম পভানে' দিয়ে সংগীত পরিচালনার কাজ শুরু করেন। এরপর ছয়ের দশকে 'আনন্দ ঘন' ছদ্মনামেও বেশ কিছু মরাঠি ছবিতে সংগীত দিয়েছেন লতা। কিশোর কুমারের কণ্ঠে 'তারে আমি চোখে দেখিনি'-ও লতারই সৃষ্টি। মহারাষ্ট্র সরকারের তরফ থেকে সেরা সংগীত পরিচালনার জন্য পুরস্কৃতও হয়েছিলেন তিনি। আর সংগীত শিল্পী হিসেবে পুরস্কার তো অজস্র। সমগ্র কেরিয়ারে মোট ২৫০টি ট্রফি এবং ১৫০টি স্বর্ণপদক জিতেছেন স্বর্ণকণ্ঠী। তিনবার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। এদেশে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত তো হয়েছেনই, এমনকী বিদেশের মাটিতেও নিজের ছাপ ফেলেছেন তিনি।

সীমাহীন প্রতিভা


অমিতাভের হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন লতা


যশ চোপড়ার সঙ্গে

অনন্ত প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। আর সেই প্রতিভাই তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে উপমহাদেশ তথা, অন্য গোলার্ধে। তাঁর গায়কী ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, তিন দেশকে একাত্ম করেছে যুগ যুগ ধরে। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়, এদেশে একাধিক কনসার্ট করেছিলেন শিল্পী। অনুষ্ঠান থেকে সংগৃহিত পুরো অর্থই তুলে দেওয়া হয়েছিল বাংলাদেশ সরকারের হাতে, মুক্তিযোদ্ধাদের ত্রাণস্বরূপ। এরপর একই বছর মুক্তিযুদ্ধ শেষে সুনীল দত্তের দলের সঙ্গে বাংলাদেশ সফরে যান কিংবদন্তি। বছরখানেক আগে সোশ্যাল মাধ্যমে সেই স্মৃতিচারণাও করেছিলেন তিনি। তাঁর বাংলাদেশ সফর, সেখানকার নানা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, সেনাবাহিনীর উড়োজাহাজে চড়ার অভিজ্ঞতার কথা জানান ভক্তদের। এরপর ১৯৭২ সালে সলিল চৌধুরীর সুরে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে কণ্ঠ দেন লতা। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবি 'রক্তাক্ত বাংলা'-য় কোকিলকণ্ঠীর 'ও দাদাভাই' বাংলাদেশের শ্রোতাদের আজও বিমুগ্ধ করে।


কে. আর নারায়ণনের হাত থেকে পদ্ম বিভূষণ নিচ্ছেন লতা


'পদ্ম বিভূষণ' হাতে জাভেদ আখতার এবং শচীন তেণ্ডুলকরের সঙ্গে

শুধু বাংলাদেশ নয়, একটা সময় ছিল যখন ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে অন্যতম সেতু ছিলেন লতা মঙ্গেশকর।

শুধু বাংলাদেশ নয়, একটা সময় ছিল যখন ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে অন্যতম সেতু ছিলেন লতা মঙ্গেশকর। দেশভাগের আগে প্রিয় শিল্পীর প্রতি যে ভালবাসা উজাড় করে দিয়েছিলেন শ্রোতারা, দেশভাগের পরও তা অক্ষুণ্ণ ছিল পুরোমানে। আর নুর জাহানের সঙ্গে কিংবদন্তির বন্ধুত্বের ইতিহাস তো সর্বজনবিদিত।



বোন আশা ভোঁসলের সঙ্গে এক মঞ্চে

গ্লোব্যাল আইকন ছিলেন লতা মঙ্গেশকর। বিশ্বের দরবারেও সমাদৃত হয়েছেন ভারতের 'নাইটিঙ্গেল'। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি লন্ডনের রয়্যাল অ্যালবার্ট হলে পারফর্ম করেন (১৯৭৪)। সেই অনুষ্ঠানের লাইভ রেকর্ডিং দু'টি ভাগে প্রকাশ করা হয়, যার প্রায় ১ লাখ ৩৩ হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল। এরপর ১৯৮৫ সালে ইউনাইটেড ওয়ে অফ গ্রেটার টরোন্টো থেকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে বিশিষ্ট ক্যানাডিয়ান সংগীতশিল্পী অ্যান মুরের অনুরোধে ১২ হাজার দর্শকের সামনে তাঁর 'ইউ নিডেড মি' পরিবেশন করেছিলেন লতা। অনুষ্ঠান থেকে সংগৃহীত অর্থের পুরোটাই অনুদানস্বরূপ পাঠিয়ে দেওয়া হয়।



'লিজিয়ঁ অফ অনর' পাওয়ার মুহূর্ত

এছাড়া ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মানেও ভূষিত হয়েছেন লতা মঙ্গেশকর। দক্ষিণ আমেরিকার গায়ানা ও সুরিনাম এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাম্মানিক নাগরিকত্ব পেয়েছেন। পেয়েছেন আরও অজস্র আর্ন্তজাতিক সম্মান এবং স্বীকৃতি। এককথায়, ধর্ম, জাতি নির্বিশেষে শ্রোতাদের ভালবাসা পেয়েছেন কিংবদন্তি। প্রিয় শিল্পীকে চিরবিদায় জানাতে গিয়ে অশ্রুসজল হয়েছে সীমান্তের এপার-ওপার। শিল্পী হিসেবে এটাও কি কম বড় প্রাপ্তি?



একটি রেডিও শো-তে সদাহাস্যমুখে



বাঁদিক থেকে: ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ, লত মঙ্গেশকর, চতুর লাল এবং পণ্ডিত রবি শঙ্কর



সলিল চৌধুরী এবং সবিতা চৌধুরীর সঙ্গে



রাহুল দেব বর্মণ, কিশোর কুমার, আশা ভোঁসলের সঙ্গে লতা মঙ্গেশকর

তবে এই বিপুল ভালবাসা, এত সম্মানের নেপথ্যে সমপরিমাণ সাধনা, সংযম এবং সংগ্রাম রয়েছে, যা কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না। মাত্র পাঁচবছর বয়সে যে জীবনযুদ্ধে নেমেছিলেন সুরসম্রাজ্ঞী, ৬ ফেব্রুয়ারি ৯২ বছরে এসে তার সমাপ্তি ঘটালেন। ঠিক সরস্বতী পুজোর বিসর্জনের সকালে। কী অদ্ভুত সমাপতন! আবার ভেবে দেখলে মনে হয়, তিনি যে লতা মঙ্গেশকর। এহেন বিস্ময়কর সমাপতন তো তাঁকেই মানায়। একবার একটি সাক্ষাৎকারে গুলজার বলেছিলেন, "ইয়ে সদি উনকি আওয়াজ কি সদি হ্যায়।" না, শুধু এই শতাব্দী নয়, আগামী অজস্র শতকও শুধু তাঁর থাকবে। যতদিন সংগীতের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা থাকবে, ততদিন শ্রেষ্ঠত্বের আসনে একজনই আসীন হবেন.... একমেবাদ্বিতীয়ম লতা মঙ্গেশকর।



উল্লেখযোগ্য পুরস্কার, সম্মান, স্বীকৃতি

১৯৬৯- পদ্মভূষণ

১৯৭২- প্রথম জাতীয় পুরস্কার (পরিচয়)

১৯৭৪- দ্বিতীয় জাতীয় পুরস্কার (কোরা কাগজ)

১৯৮৯- দাদা সাহেব ফালকে

১৯৮৯- সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি থেকে লেটার অফ ডক্টর

১৯৯০- তৃতীয় জাতীয় পুরস্কার (লেকিন...)

১৯৯৯- পদ্মবিভূষণ

২০০১- ভারতরত্ন

২০০৭- নাইট অফ দ্য লিজিয়ঁ অফ অনর (ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মান)

২০০৮- ওয়ান টাইম অ্যাওয়ার্ড ফর লাইমটাইম অ্যাচিভমেন্ট

সংগীতেরই নয়, পরিবারেরও অভিভাবক...

লতা মঙ্গেশকর

সংবেত্তা চক্রবর্তী



কিশোরীবেলায় পরিবারের মাথায় 'ছাতা' হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। সদস্যদের সেই পারস্পরিক স্নেহ এবং শ্রদ্ধার সম্পর্কে এতটুকু ভাটা পড়েনি কোনওদিন। নাকি পড়েছিল? বোঝার চেষ্টায় সংবেত্তা চক্রবর্তী

গল্পটা ক্যাসেটের যুগের। এক-একজন শিল্পীর গানের কালেকশন বেরত তখন। কোনও গানের আগে শিল্পীর নিজের কণ্ঠে শোনা যেত সেই গানের গল্প। তেমনই এক ক্যাসেটে 'আজা আজা, ম্যায় হুঁ পেয়ার তেরা'র নেপথ্যকাহিনি শুনিয়েছিলেন আশা ভোঁসলে। গানটা শুনে তাঁর মনে হয়েছিল বড্ড কঠিন। গাইতে পারবেন কি? বোনের অস্থির-অস্থির ভাব দেখে 'বড়ি দিদি' জানতে চেয়েছিলেন, কী হয়েছে? আশা বলেছিলেন তাঁকে সব কথা। "দিদি তখন আমাকে বলেছিলেন, 'আশা, তু শায়েদ ভুল গয়ি হ্যায় কি তু মঙ্গেশকর হ্যায়!' তাঁর ওই 'মঙ্গেশকর' বলার ধরনেই সাহস ফিরে এসেছিল আমার। তার পর দিদি বলেছিলেন, 'যা, তু যশস্বী হোকে আয়েগি,'" ক্যাসেটে বাজছিল আশার গলা! এ গল্প যে শুনবে, কোনও সিবলিং রাইভালরির গল্প আর তার কখনও বিশ্বাস হতে পারে?

এই ছিলেন আশার 'বড়ি দিদি', সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর, সংসার চালানোর জন্য যিনি স্কুল যাওয়ার বয়স থেকে রোজগারের চেষ্টায় কোমর বাঁধেন। ভাই-বোনেরা প্রতিষ্ঠা পেয়ে যাওয়ার পরও তাঁদের মাথা থেকে আশ্বাসের হাত সরান না কখনও! সারাটা জীবনই যিনি উৎসর্গ করে দিলেন দু'টি জিনিসের জন্য... সংগীত এবং পরিবার।

মা-বাবা, আজও তোমাদের কথা ভাবি...



মায়ের সঙ্গে ভাইবোনেরা।

১৯২৯ সালে জন্ম লতার। বাবা দীননাথ মঙ্গেশকর, মা সেবন্তী মঙ্গেশকর। লতার 'মাঈ'... যাঁর মৃত্যুদিনে লতা সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন, 'আমরা সব মঙ্গেশকররা ওঁর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করি'। আরও লিখেছিলেন, 'বাবা স্বর্গে যাওয়ার পর মাঈ আমাদের মা এবং বাবা, দুই-ই হয়ে ছিলেন। ওঁর কাছ থেকেই আমরা আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচতে শিখেছি। মাঈ, আজও তুমি আমার শক্তি। আজও তোমার দেখানো পথে হাঁটছি। আর দিন-রাত তোমাকে আর বাবা-কে মনে করছি'।

লতাকে আমরা সুরের জাদুকরী হিসেবে জানলেও, তাঁর কেরিয়ার কিন্তু শুরু গানের পাশাপাশি অভিনয় দিয়েও! অভিনয়ের সঙ্গে কোথাও একটা নাড়ির বন্ধন ছিল তাঁর। 'বলবন্ত সংগীতমণ্ডল' নামে এক নাটকের কোম্পানি ছিল লতার বাবা দীননাথের। জন্মের পর লতার নাম রাখা হয়েছিল হেমা। তারপর নাম পালটে 'লতা' রাখা হয়, দীননাথেরই এক নাটকের চরিত্র লতিকার নামানুসারে। শোনা যায়, নয় (মতান্তরে পাঁচ) বছর বয়সে বাবার নাটকে নারদের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি। বাবাকে কথা দিয়েছিলেন, তাঁরই মতো দর্শকের থেকে 'এনকোর' আদায় করে ছাড়বেন। সে কথা রেখেওছিলেন। যদিও এই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু জানা যায় না। তবে এটা নিশ্চিত, যে গানের শিক্ষা প্রথম বাবার কাছেই পান তিনি। কিন্তু সেই বাবা যখন হার্টের অসুখে হঠাৎ করে চলে গেলেন, তখন অভিনয়ই হয়ে উঠল তাঁর বিপত্তারণ!

বড় দিদি...

লতা তখন নেহাতই কিশোরী। কিন্তু হলে কী হবে? বাড়িতে রোজগেরে তো আর কেউ নেই। তাঁর পরে আরও তিন বোন- মীনা, আশা, উষা। আদরের ছোটভাই হৃদয়। সকলের দেখাশোনা তো তাঁকেই করতে হবে, বড় দিদি না তিনি? এগিয়ে এলেন পারিবারিক বন্ধু, মাস্টার বিনায়ক দামোদর কর্ণাটকি। তাঁরই সহায়তায় মরাঠি ছবিতে টুকটাক গান এবং অভিনয় করতে শুরু করলেন লতা। মুম্বইয়ে এসে সংগীত শিক্ষার পাশাপাশি মাস্টার বিনায়কেরই এক হিন্দি ছবিতে অভিনয় করলেন এবং ভজন গাইলেন তিনি। 'বড়ি মা' নামে সেই ছবিতে অভিনয়

করেছিলেন বোন আশাও।



ভাই হৃদয়ের সুরে গাইতে ভালবাসতেন তিনি।

অভিনয় করতে কিন্তু মোটেই ভালবাসতেন না লতা। পরে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "আমি কেরিয়ার শুরু করেছিলাম অভিনয় দিয়ে। কিন্তু অভিনয় করতে আমার কখনওই ভাল লাগত না। মাস্টার বিনায়কের সঙ্গে কাজ করতাম। ছবিতে অভিনয় করতাম। কিন্তু বড্ড ছোট ছিলাম তো, অভিনয়টা উপভোগ করতে পারতাম না। মেক-আপ করা, ক্যামেরার সামনে হাসা, কাঁদা- সবই বিরক্তিকর লাগত! কিন্তু গান গাইতে ভালবাসতাম ছোটবেলা থেকেই।" ১৯৪৭ সালে মাস্টার বিনায়কের মৃত্যু হয়। তাঁরা ড্রামা কোম্পানিও বন্ধ হয়ে যায়। তারপর পুরোপুরি প্লে-ব্যাক সিংগিংয়ে মন দেন লতা। তার আগে অবধি কিন্তু যা ভালবাসতেন এবং যা মোটেই পছন্দ করতেন না, দুটো কাজই সমানতালে চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। সংসার চালাতে হবে যে! জীবনের এই কঠিন দিনগুলো অনেক কিছু শিখিয়েছিল লতাকে। সঙ্গে ছিল তাঁর বাবা-মায়ের শিক্ষা, যা তিনি সারাজীবন মেনে চলেছেন। যারা দরিদ্র, দুঃস্থ, সবসময় তাদের সাহায্য করা উচিত। "কাউকে কিছু দিতে পারায় যে আনন্দ, কিছু পাওয়ায় সে আনন্দ নেই," পরে বলেছিলেন লতা। "হতে পারে অনেকেই আমাকে বোকা বানিয়ে চলে যায়। কিন্তু আমি বরাবর বিশ্বাস করি, আমার যা আছে, তা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া উচিত।" সুরসম্রাজ্ঞী হয়ে গোটা দেশের মনজয় করে নেওয়ার পরেও পারিবারিক শিক্ষা এবং মূল্যবোধকে ভোলেননি তিনি।

বোনকে স্কুলে ঢুকতে দেবে না? আমিও যাব না!



'বচপন কে দিন ভি কেয়া দিন থে'- দিদি চলে যাওয়ার পর আশার ইনস্টা-পোস্ট।

কিন্তু এসবের আগে লতা স্কুলে যেতেন না? না, যেতেন না। বা বলা ভাল গিয়েছিলেন, এক দিনের জন্য! সেই যে ফিরেছিলেন, আর যাননি। কেন জানেন? লতা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন ছোট্ট বোন আশাকে। তখন আশার বয়স মাসদশেক। ক্লাসে ঢুকে, বোনকে কোলে নিয়ে বসলেন লতা। স্বাভাবিকভাবেই টিচার আপত্তি জানিয়েছিলেন আশাকে স্কুলে ঢুকতে দিতে। সেই যে লতা চলে এলেন, আর স্কুলমুখো হননি! পরে গৃহ-সহায়ক বিঠ্ঠলকে বলেছিলেন, তাঁকে মরাঠি বর্ণমালা শেখাতে। তার আগে অবশ্য কিছু নার্সারি ক্লাসে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু প্রথাগত লেখাপড়ার ধারও ধারেননি, তাঁর আদরের ছোট্ট বোনকে স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে।



একান্ত মুহূর্তে দুই কোকিলকণ্ঠী...

কাছাকাছি সময়ে প্লে-ব্যাক করা শুরু করেছিলেন লতা আর আশা। দু'জনের গানের ধরন ছিল ভিন্ন। সেই বুঝেই সংগীত পরিচালকেরা গান দিতেন তাঁদের। আবার বলিউডের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে তাঁদের যুগলবন্দিগুলোও... 'সখী রি, সুন বোলে পপিহা উস পার', 'মেরে মেহবুব মেঁ কেয়া নহি', 'অ্যায় কাশ কিসি দিওয়ানে কো', 'মন কিঁউ বেহকা রে বেহকা আধি রাত কো' এবং আরও কত গান! লতা এবং আশার প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে প্রভূত চর্চা সে সময়ও হত, এখনও হয়। নয়ের দশকে সাই পরাঞ্জপে তো একটি ছবিই বানিয়ে ফেলেছিলেন, 'সাজ' নামে... যার ভিত্তি 'নাকি' ছিল লতা-আশার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সেই নয়ের দশকেই এক সাক্ষাৎকারে সব গুজবে জল ঢেলেছিলেন আশা স্বয়ং। "উনি (লতা) আমার চেয়ে চার বছরের বড়। কিন্তু আমার মায়ের মতো," বলেছিলেন তিনি। "পেশা এবং সম্পর্ককে আলাদাই রাখি আমরা। বরাবরই সুস্থ প্রতিযোগিতা ছিল আমাদের মধ্যে।" তবে তিনি এ কথাও বলেছিলেন, "ব্যাপারটা ছিল দু'জন মানুষের চাঁদে যাওয়ার মতো। যে

প্রথম চাঁদের মাটিতে পা রাখল, লোকে তাকেই প্রশংসায় ভরিয়ে দিল!" কোথাও হয়তো একটু অভিমানও ছিল আশার! তবে বোঝাই যাচ্ছে, সে অভিমান তাঁর দিদির উপর নয়, সময়ের উপর। আর হয়তো কিছুটা আশপাশের লোকের উপরেও। "নানা লোকে নানা গল্প বানাত (আমাদের মধ্যে) সমস্যা তৈরি করার জন্য," একবার বলেছিলেন তিনি। "কিন্তু রক্তের বন্ধন তো রক্তের বন্ধনই! এমনও হয়েছে, একই অনুষ্ঠানে আমরা দু'জনে গিয়েছি। এক ধরনের লোক থাকে না ইন্ডাস্ট্রিতে? তারা এসে দিদির সঙ্গে কথা বলে, আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলে গিয়েছে, নিজেদের আনুগত্য দেখানোর জন্য! পরে আমি আর দিদি খুব হাসতাম এদের নিয়ে।"

মীনা, উষা: ছোটবেলা, বড়বেলা...



মীনা

লতা এবং আশার মাঝখানে ছিলেন মীনা মঙ্গেশকর-খাড়িকর। লতার সঙ্গে মাত্র দু'বছরের তফাত। স্বাভাবিকভাবেই ছোটবেলায় সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিলেন দু'জনে। পরিবারের দেখাশোনার জন্য যে লতাকে নিজের ছোটবেলা বিসর্জন দিতে হয়েছিল, তা নিয়ে গভীর আক্ষেপ রয়ে গিয়েছে মীনার মনে। "দিদিকে নিয়ে আমার সবচেয়ে সুন্দর স্মৃতিগুলো হল, দিদির ছোটবেলার স্মৃতি... সেই ছোটবেলা, যা তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। ছোটবেলায় দিদির গান, দিদির হাসি... সব এখনও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে আমার মনে," বয়ান মীনার। "কিন্তু বোন হিসেবে, মেয়ে হিসেবে নিজের সব দায়িত্ব নিখুঁতভাবে পালন করেছিল দিদি।" মীনা নিজে হিন্দি এবং মরাঠি ইন্ডাস্ট্রিতে গায়িকা এবং সংগীত পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন। অনেকেই জানেন না, বলি-ইতিহাসের এক কাল্ট ক্লাসিক গানে কণ্ঠ দিয়েছিলেন লতা, মীনা, উষা, তিন বোন। 'মাদার ইন্ডিয়া' ছবির 'দুনিয়া মেঁ হম আয়ে হ্যায় তো জিনা হি পড়েগা'। লতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে বইও লিখেছেন মীনা। মীনার জন্মদিনে কেক কাটার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করেছেন লতা। বোঝাই যায়, দুই বোনের সম্পর্ক বরাবরই কতটা ঘনিষ্ঠ ছিল!



উষা এবং হৃদয়

চার বোনের মধ্যে ছোট হলেন উষা মঙ্গেশকর। তিনি নিজেও নামী সংগীতশিল্পী, প্লে-ব্যাকে এসেছিলেন লতা-আশার কিছু বছর পরে। শেষ জীবনে লতার ছায়াসঙ্গী ছিলেন উষা। শোনা যায়, লতার সাক্ষাৎকার নিতে গেলেও তাঁর মাধ্যমেই লতার কাছে পৌঁছতে হত। লতা যে চলে গিয়েছেন, সংবাদমাধ্যমকে সে খবরও জানান উষাই। তাঁর 'লতা দি' যে জিনিয়াস, সে কথা বরাবর মুক্তকণ্ঠে বলেছেন উষা, "সব ভাষায় গাইতে পারেন উনি। বাংলা বলেন ঝরঝর করে। কত পড়াশোনা করেন! আর রিহার্স করা থামান না কখনও।" একসঙ্গে গানের মহড়া দেওয়ার অভিজ্ঞতাও বর্ণনা করেছেন তিনি, "কনসার্ট থাকলে অনেক দিন আগে থেকে রিহার্সাল শুরু করি আমরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মহড়া দিই। উনি (লতা) সংগীত পরিচালকের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে দেন। ততক্ষণ গাইতে থাকেন, যতক্ষণ না মিউজ়িক ডিরেক্টর 'ওকে' বলছেন।" লতা এবং আশা, দু'জনকেই নিজের জীবনের 'গাইডিং ফোর্স' হিসেবে বর্ণনা করেছেন উষা। "ওঁরা আমাকে মানুষ এবং সংগীতশিল্পী হিসেবে উত্তরণের দিশা দেখিয়েছেন। সারাজীবন ওঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব আমি। ভালবাসব চিরকাল," বলেছেন তিনি।

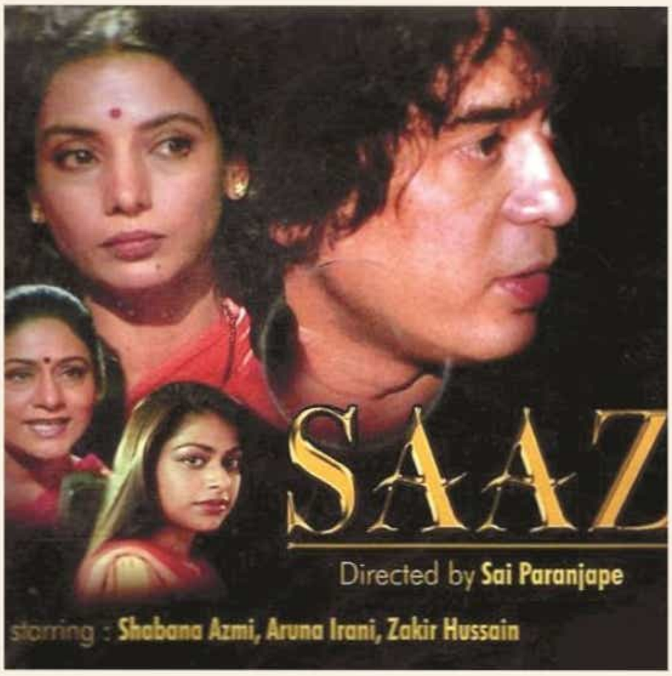
বড় আদরের ছোট ভাই...



পাঁচ ভাইবোন

চার বোনের ছোট ভাই, হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর। 'সুবাহ্', 'লেকিন' এবং 'মায়া মেমসাব'এর মতো ছবির সংগীত পরিচালক তিনি। মীরা, কবির, সুরদাসের গান নিয়ে বানিয়েছেন একাধিক অ্যালবাম। জীবনের একদম সাঁঝবেলায় এসে এক সাক্ষাৎকারে লতা বলেছিলেন, হৃদয়নাথ তাঁর প্রিয় সংগীত পরিচালকদের অন্যতম, লতার জন্য তাঁর বানানো 'মায়া মেমসাব' ছবির গানগুলো শিল্পীর ভারী পছন্দের! আর হৃদয়নাথের কথায়, লতা দিদি তাঁর

'মেন্টর'। গান তিনি শিখেছেন গুরুদের কাছে। কিন্তু দিদির কাছে শিখেছেন কী করে আত্মসম্মান বজায় রাখতে হয় - সেই শিক্ষা, যা লতা পেয়েছিলেন তাঁর মায়ের কাছে! অহংকার এবং ঔদ্ধত্যকে কী করে গলা টিপে মারতে হয়, তা-ও হৃদয়নাথের দিদির কাছেই শেখা। জানিয়েছিলেন, এত বছর ধরে দিদিকে সুরসম্রাজ্ঞীর আসনে দেখছেন তিনি। কিন্তু লতা কখনও মানতেই চাইতেন না, তিনি বিরাট কিছু করেছেন! দিদির প্রতিভা যে আলাদা, সে কথা ছোট্টবেলাতেই বুঝে গিয়েছিলেন হৃদয়নাথ, "পাঁচ বছর বয়স তখন আমার। ভাইবোনেরা মিলে বাবার কম্পোজ়িশনগুলো গাইতে বসতাম। তখনই বুঝতে পারতাম, দিদি ওয়ন্ সামওয়ান স্পেশ্যাল।" দিদির কথা বলা, হাসি, গান গাওয়া, ভাবনাচিন্তা- সব কিছুর সঙ্গে বাবা দীননাথের মিল খুঁজে পেতেন হৃদয়। তাঁর নিজের মনের গঠনও দিদির মতো, বলেছিলেন একবার, "মনে হয়, কে যেন অদৃশ্য সুতো দিয়ে আমাদের বেঁধে রেখেছে। আমরা যদি দু'জনেই কোনও কাজ করা উচিত বলে মনে করি, সেটা করেই ছাড়ি। কে কী বলল, আমাদের যায়-আসে না।" দিদির বড় আদরেরও ছিলেন ছোট ভাই। ১৯৮০ সালের কাছাকাছি বয়সে এক অনুষ্ঠানে পারফর্ম করতে গিয়েছেন হৃদয়নাথ, বড় দিদি ফোন করে খোঁজ নিচ্ছেন তাঁর থাকার ব্যবস্থা ঠিকঠাক আছে কি না... এমনই ছিল ভাইবোনের সম্পর্ক।



'সাজ়' ছবির পোস্টার।

লতা এবং আশার 'প্রতিদ্বন্দ্বিতা' বহুল-চর্চিত। কিন্তু বাকি ভাইবোনেরাও তো একই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে গেলেন এত বছর। প্রত্যেকেই কিন্তু নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। মীনাকে শ্রোতারা বেশি করে চেনেন মরাঠি ইন্ডাস্ট্রির কম্পোজ়ার হিসেবে। উষা একাধিক ভাষায় গান গেয়েছেন, পাকাপোক্ত জায়গা তৈরি করেছেন বলিউডেও। 'ম্যায় তো আরতি উতারুঁ রে' থেকে 'মুঙ্গড়া', সব গানে তিনি সমান সাবলীল। কিন্তু শুধু দিদিরা কেন, কারও সঙ্গেই প্রতিযোগিতায় বিশ্বাসী ছিলেন না কোনওদিন। তাই প্রতিযোগিতার চাপও নেননি। আর হৃদয়নাথ তো কম্পোজ়ার... নিজের ক্ষেত্রে অন্যতম সেরার আসনে! একে অপরের প্রতি ভালবাসা ছাড়াও কাজ এবং জীবনদর্শনের এই ভিন্নতাও সম্ভবত পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে পেশাগত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে ঢুকতে দেয়নি। অদৃশ্য এক সুতোর কথা বলেছিলেন হৃদয়নাথ। পাঁচ ভাইবোনের সম্পর্ককে কাছ থেকে দেখতে গেলে মনে হয়, সেই সুতো ছিল পারিবারিক মূল্যবোধ- যা মঙ্গেশকরদের শিরায়-শিরায় বইছে। আর ছিল ভাইবোনেদের জন্য বড় দিদির অপার স্নেহ, এবং তাঁর প্রতি ভাইবোনেদের শ্রদ্ধা। লতার নশ্বর শরীর পঞ্চভূতে মিলিয়ে গিয়েছে ঠিকই। কিন্তু ভক্তদের জন্য গানের পাশাপাশি, ভাইবোনেদের জন্য তিনি রেখে গেলেন এই স্নেহ, যা তাঁর হাসির মতোই উজ্জ্বল হয়ে থাকবে মঙ্গেশকরদের স্মৃতিতে, চিরকাল।

ছবি সৌজন্য: আনন্দবাজার আর্কাইভ, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ইন্টারনেট

নিজেকে ভালবাসতেন তিনি...

লতা মঙ্গেশকর

সংবেত্তা চক্রবর্তী।



*তথাকথিত 'একা' থাকা মানেই যে বিষাদ-আচ্ছন্নতা নয়, দেখিয়ে দিয়েছেন **লতা মঙ্গেশকর**। পরিবারের, ভক্তদের এবং নিজেই নিজেকে ভালবাসার উদাহরণ হয়ে রয়ে গেলেন তিনি। লিখছেন সংবেত্তা চক্রবর্তী।*

"এবার আমি আমার থেকে আমাকে বাদ দিয়ে
অনেক কিছু জীবনে যোগ দিলাম।
ছোট যত আপন ছিল, বাহির করে দিয়ে
ভুবনটারে আপন করে নিলাম।"



লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া বিখ্যাত বাংলা গান। তাঁর জীবনটার দিকে যদি একবার ফিরে তাকানো যায়, তা হলে এই গানকে তাঁর জীবনদর্শন বললেও হয়তো অত্যুক্তি হবে না। তফাত শুধু একটাই জায়গায়, 'নিজের থেকে নিজেকে' কখনওই বাদ দেননি তিনি। বরং আত্মমর্যাদার সঙ্গে মাথা উঁচু করে বেঁচেছেন বরাবর। জীবনের ওঠাপড়ার মাঝেই খুঁজে নিয়েছেন ছোট-ছোট খুশি। ভালবাসায় ভরিয়ে তুলেছেন নিজেকে। সে ভালবাসার এতটাই জোর, যে কোনও 'একাকিত্ব'র আঁচ লাগতে পারেনি তাঁর গায়ে।



ভাইবোনেদের সঙ্গে পারফরম্যান্স

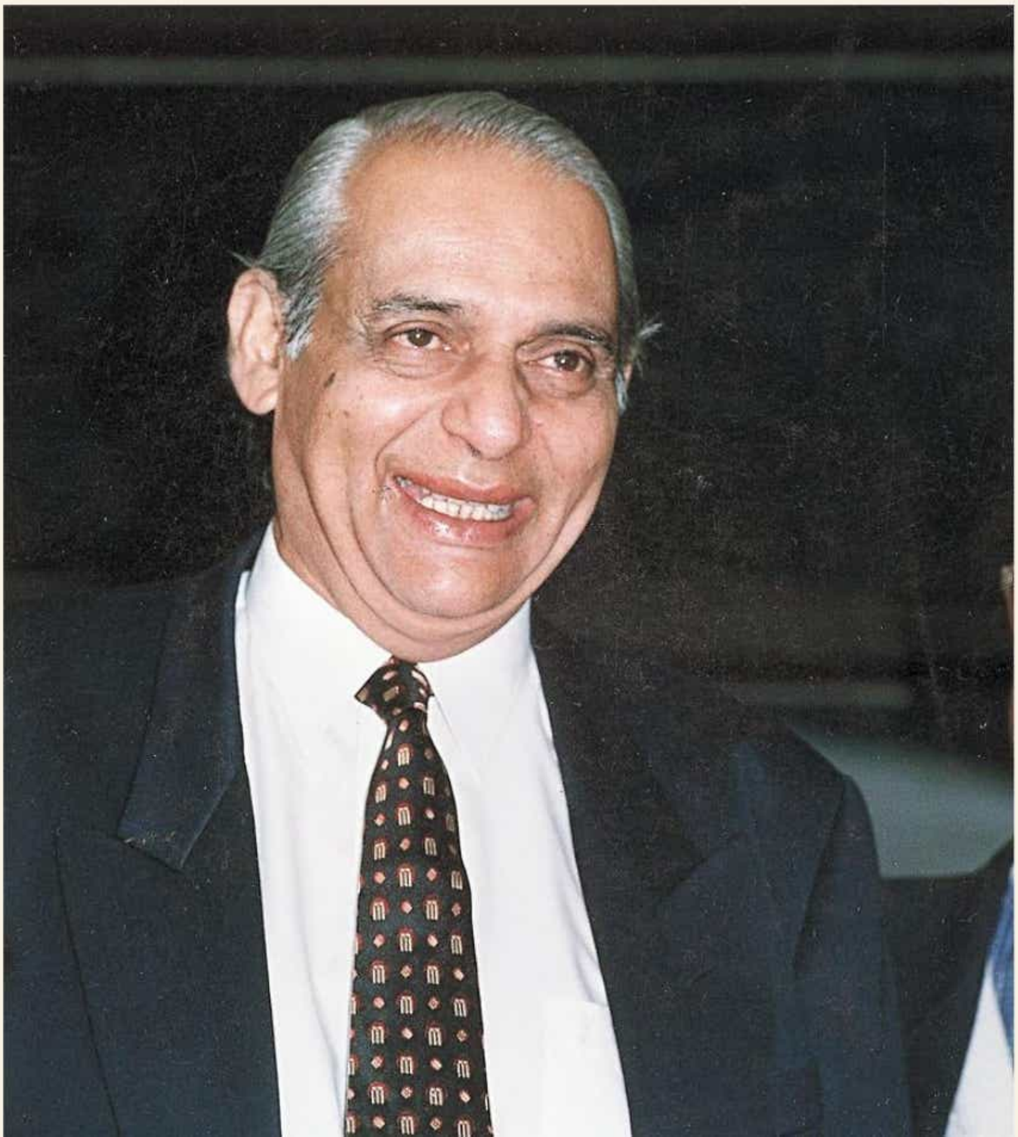
বিয়ের কথা হয়েছিল, কিন্তু সম্ভব হয়নি...

লতা যে সময়ে বড় হয়েছিলেন, তখন যে-কারও জীবনেরই একটা অবশ্যম্ভাবী ধাপ ছিল বিয়ে, সংসার। লতার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হত না, যদি না তাঁর বাবা দীননাথ মঙ্গেশকরের অকালপ্রয়াণ ঘটত। লতা তখন কিশোরী। গান গেয়ে, পুতুল খেলে, পরিবারের সঙ্গে খুশিতে দিন কাটছে। এমন সময় বাবার মৃত্যু! তাঁকে নেমে পড়তে হল অর্থ রোজগারের চেষ্টায়। পরে তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "বাড়ির সব সদস্যের দায়িত্ব এসে পড়েছিল আমার উপর। খুব কম বয়স থেকে কাজ করতে শুরু করেছিলাম। ওই অবস্থায় বিয়ে করা আর সম্ভব হয়নি, যদিও কথা উঠেছিল অনেকবার।"



বোন মীনারও এই বিষয়টা নিয়ে খুব দুঃখ ছিল। "দিদি সব পেলেন- নাম, যশ, অর্থ- খালি নিজের একটা 'পরিবার' পেলেন না," বলেছিলেন তিনি একবার। কিন্তু সত্যিই কি তাই? নিজের পরিবার মানে কি শুধু স্বামী, সন্তান, শ্বশুরবাড়ি? এখনকার সময়ের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে তো এই কথাটার কোনও মানে নেই... তখনকার সময়েও যে ছিল না, তার উদাহরণ লতা স্বয়ং। শুরু থেকেই দেখা যাক। নিজের কিশোরীবেলাকে বিসর্জন দিয়ে, 'ওম্যান' হওয়ার আগেই 'ওয়র্কিং ওম্যান' হয়ে গেলেন তিনি... সে তো নিজের পরিবারের জন্যই! জীবনের শেষ দিন অবধি বাবা-মায়ের আদর্শে পথ চলেছেন। ভাই-বোনেদের, তাঁদের সন্তানদের 'অভিভাবক' হয়ে থেকেছেন। কঠিন গানের আগে আর-এক কোকিলকণ্ঠী বোন আশা ভোঁসলেকে ভরসা জোগানো থেকে শুরু করে ভাই কোনও অনুষ্ঠানে গেলে তাঁর থাকার ব্যবস্থার বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া... এর পরেও কি মেনে নেওয়া যায়, লতার 'নিজের পরিবার' ছিল না? আর সংগীতজগতে তো যে-কোনও মানুষের কাছেই তিনি ছিলেন 'লতা দিদি'। রেকর্ডিংয়ে নিজের টিফিনবক্স খুলে কাউকে খাবার এগিয়ে দিচ্ছেন, কাউকে ফোন করে তাঁর বাড়ির লোকেদের খোঁজখবর নিচ্ছেন, কোনও সহশিল্পীকে গান রেকর্ড করার ফাঁকে দিচ্ছেন মূল্যবান টিপ্স। ঠিক দিদির মতো, মায়ের মতো। তিনি চলে যাওয়ার পর সোনু নিগম বলেছেন, 'দ্বিতীয়বার মা-কে হারালাম'। তাঁর মৃত্যুর শোক অবশ্য শুধু সংগীতদুনিয়াকেই আচ্ছন্ন করেনি, ভেঙে পড়েছেন সচিন তেণ্ডুলকর, 'মনে হচ্ছে নিজের একটা অংশকে হারিয়ে ফেললাম বরাবরের মতো'! স্মৃতিচারণ করেছেন শোকাচ্ছন্ন শোয়েব আখতার... লতা বলেছিলেন, তাঁকে 'মা' বলে ডাকতে! লতার চলে যাওয়ার খবরে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিচালক মধুর ভাণ্ডারকর, 'সব শেষ হয়ে গেল, আমার সব শেষ হয়ে গেল'! এত মানুষের ভালবাসা যাঁর সঙ্গে, তিনি কী করে একা হতে পারেন? আর এত ভালবাসা পেয়েছিলেন তো 'ভুবনটারে আপন করে' নিতে পেরেছিলেন বলেই!

প্রেম কি এসেছিল নীরবে?



কিন্তু যাঁর কণ্ঠ গোটা দেশের কাছে হয়ে উঠেছিল প্রেমের সংজ্ঞা, তাঁর জীবনে প্রেম কি কখনও আসেনি? কেউ কেউ লতাকে এই প্রশ্নটা করার চেষ্টা করেছেন। প্রতিবারই সৌজন্যের সঙ্গে এড়িয়ে গিয়েছেন লতা। কখনও হয়তো বলেছেন, "সকলেরই জীবনে দুঃখের মুহূর্ত আসে। আমার জীবনেও এসেছে। কিন্তু তা সাময়িক মাত্র।" ক্রিকেটার রাজ সিংহ দুঙ্গারপুরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে লিখেছেন রাজ সিংহের ভাগনি, রাজশ্রী। তাঁর কথা অনুযায়ী, হৃদয়নাথ মঙ্গেশকরের মাধ্যমে আলাপ হয়েছিল রাজ সিংহ এবং লতার। সেই আলাপ পরিণতি পায় প্রেমে। পরিবারের আপত্তি ছিল বলে লতাকে বিয়ে করতে পারেননি রাজ সিংহ... কিন্তু সে জন্যই নাকি দু'জনের কেউ কখনও বিয়ে করেননি।

তারও আগে সংগীতকার-গায়ক সি রামচন্দ্রের সঙ্গে লতার জুটি জন্ম দিয়েছে বহু অমর গানের। এক দিকে 'ইয়ে জ়িন্দেগি উসিকি হ্যায়', যা এখনও শ্রোতাদের চোখে জল এনে দেয়- আর এক দিকে 'শোলা যো ভড়কে'র মতো খুশির গান, যেখানে লতার সঙ্গে কণ্ঠ দিয়েছিলেন স্বয়ং সংগীতকার! এঁদের দু'জনের সংগীতের বাইরে কোনও সম্পর্ক ছিল কি না, তা নিয়ে বহু চর্চা বাতাসে ভাসে এখনও। সি রামচন্দ্র নিজেও নাকি তাঁর জীবনে এক মহিলার কথা বলেছেন, যাঁকে তিনি 'সীতা' বলে উল্লেখ করেছেন। সেই 'সীতা'র সঙ্গে নাকি তাঁর সম্পর্ক ছিল এবং তা নিয়ে ওঠাপড়াও হয়েছিল অনেক। শেষে একদিন সেই মহিলা এক 'রাজকুমার'এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন সি রামচন্দ্রের। বলেন- একদিন তুমি আমার জীবনে যা ছিলে, এ এখন তা-ই। এসবের মধ্যে কোথাও লতার নাম উচ্চারণ করেননি তিনি। দু'জনের সাংগীতিক জুটিও এক সময় ভেঙে যায়। কিন্তু তাঁদের 'সম্পর্কে'র বিষয়ে চর্চাই শোনা গিয়েছে কেবল, পাকাপোক্ত তথ্য সেভাবে মেলেনি।



সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ছবি দিয়ে সকলকে ওয়র্ল্ড ফোটোগ্রাফি ডে-র শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন লতা

লতা অবশ্য এ সব নিয়ে একটা কথাও বলেননি কখনও। কেউ প্রশ্ন করলে উত্তর দিয়েছেন, "কিছু কথা মনের মধ্যে থাকাই ভাল। তা-ই থাক।" তাঁর প্রেম-জীবন নিয়ে চর্চা করে যারা, তাদের সম্পর্কে লতার বক্তব্য ছিল সোজাসাপটা, "লোকে তো কথা বলবেই! তাদের উপেক্ষা করতে জানতে হবে। না হলে জীবনে খুশি থাকা যাবে না।" 'অতীত'কে হয়তো হৃদয়ে রেখে দিয়েছিলেন সযত্নে। কিন্তু তা বলে খুশিতে বাঁচতে ভুলে যাননি লতা!

আমি জীবনকে ভালবাসি...



হাসিতে উজ্জ্বল...

লতা মঙ্গেশকরের নিজের মুখের কথা এটা। "জীবনে চলার পথে অনেক চড়াই-উতরাই এসেছে। তা-ও আমি জীবনকে ভালবাসি। ৭১ বছর হয়ে গেল ইন্ডাস্ট্রিতে। এখান থেকে খুব সুন্দর দেখতে লাগে জীবনটাকে!" নিজেকে ভালবাসার সবচেয়ে বড় অঙ্গ হল, নিজের ভাললাগাগুলোর পিছনে সময় দেওয়া। লতা ঠিক তা-ই করতেন। জীবনের অধিকাংশ সময়টাই অন্যতম প্রিয় বিষয় নিয়ে কাটিয়ে দিতে পেরেছিলেন তিনি- গান। তা ছাড়া জীবনের অন্য ছোট-ছোট খুশিগুলোকেও উপভোগ করতেন চুটিয়ে। রীতিমতো খাদ্যরসিক ছিলেন লতা। মশলাদার সি-ফুড আর মাটন তাঁর ভারী প্রিয় ছিল। তা ছাড়াও লন্ডনের এক রেস্তরাঁয় গেলে জিরা চিকেন, মেথি চিকেন আর ডাল মাখানি অর্ডার করতেনই! ভালবাসতেন চকোলেট খেতে। সে গল্প জানা যায় ওয়াহিদা রহমানের অভিজ্ঞতা থেকে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর বাংলাদেশের সাহায্যার্থে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করার পরিকল্পনা করছিলেন ওয়াহিদা। লতাকে সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অনুরোধ করেন তিনি, লতা রাজি হননি। টানা দশ দিন ধরে তাঁকে রাজি করাতে পারেননি ওয়াহিদা। তার পরেই লতার চকোলেট-প্রেমকে কাজে লাগান তিনি। প্রচুর চকোলেট পাঠাতে শুরু করেন লতার বাড়িতে, প্রতি দিন। অবশেষে লতা রাজি হয়ে যান। তিনি বলেওছিলেন, "ওয়াহিদা, তুমি তো খুব স্মার্ট! আমার দুর্বলতাটা ধরে ফেললে!" ভালবাসতেন রান্না করতেও। "আমার হাতে তৈরি গাজরের হালুয়া আর পসন্দা খেতে সকলে ভালবাসে," বলেছিলেন একবার। তবে লতা নিজে কিন্তু ভক্ত ছিলেন বোন আশা ভোঁসলের হাতের রান্নার! মাঝে মাঝেই নাকি আশার হাতে তৈরি শামি কাবাব খেতে চাইতেন। পুণেতে মঙ্গেশকর পরিবারের একটি রেস্তরাঁ রয়েছে, যেখানে মেনু তৈরির পিছনে অনেকটাই অবদান ছিল লতার। অনুজ এক শিল্পীর কাছে এই প্রতিবেদকের শোনা গল্প, কীভাবে শেষ বয়সে নিজের ঘরেই কুকিং রেঞ্জ আনিয়ে রান্না করতেন তিনি!



লতার বাড়িতে বসে আইপিএল দেখার মুহূর্তে সচিন-অঞ্জলি

লতার আর এক প্যাশন ছিল ফোটোগ্রাফি। তবে পরের দিকে আর ছবি তুলতেন না, ডিজিট্যাল ক্যামেরার কারিকুরি বুঝতে পারতেন না বলে। নিজের পুরনো ব্ল্যাক-অ্যান্ড-হোয়াইট ক্যামেরাটাও বিক্রি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ছবি তোলার প্রতি তাঁর ভালবাসা একটুও কমেনি। 'রং দে বসন্তি'র সেট-এ ফোনেই ছবি তুলেছিলেন এ আর রহমান এবং প্রসূন জোশীর। সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলেও ক্যামেরা হাতে নিজের ছবি দিয়ে সকলকে ওয়র্ল্ড ফোটোগ্রাফি ডে-র শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন লতা। ক্রিকেটের প্রতি তাঁর ভালবাসা তো সর্বজন-চর্চিত! শিল্পীর অন্য ভালবাসার জায়গা ছিল ওয়াইল্ডলাইফ। শর্মিলা ঠাকুরের কথায়, তাঁর স্বামী, মনসুর আলি খান পটৌডিও ওয়াইল্ডলাইফ নিয়ে উৎসাহী ছিলেন। ক্রিকেট ছাড়াও দু'জনের এই পছন্দের জায়গাটা এক ছিল বলেই বোধহয় তাঁদের বন্ধুত্ব আরও পোক্ত হয়েছিল। শর্মিলা জানিয়েছেন, লতা নাকি মাঝে মাঝে মাঝেই একা জঙ্গলে বেড়াতে চলে যেতেন। নির্জনে প্রকৃতির সান্নিধ্য উপভোগ করতে ভালবাসতেন।



রান্না করছেন সুরকার অনিল বিশ্বাস, পাশে লতা।

নির্জনে ডুবে থাকতেন বইয়েও। প্রথাগত শিক্ষা সম্পূর্ণ না করতে পারলেও তাঁর পুস্তকপ্রেম ছিল দেখার মতো। "নিজের ঘরে বসে বই পড়তে আমি খুব ভালবাসি," বলতেন নিজেই। "বইয়ের পৃথিবীটা যেন আলাদাই এক জগৎ! তার মধ্যে হারিয়ে যেতে খুব ভাল লাগে আমার।" আর তাঁর পছন্দের হলিডে ডেস্টিনেশনের নাম শুনলে চমকাবেনই। লাস ভেগাস! "শুনতে অদ্ভুত লাগতে পারে, কিন্তু যখনই আমি আমেরিকায় যেতাম, লাস ভেগাসে গিয়ে সময় কাটাতে খুব ভাল লাগত," বলেছিলেন শিল্পী। "খুব এক্সাইটিং শহর! স্লট মেশিনে খেলতেও দারুণ লাগত। রুলে বা কার্ডস খেলিনি কখনও, কিন্তু মাঝে-মাঝে সারা রাত স্লট মেশিনে বসে কাটিয়ে দিতাম। ভাগ্য ভাল, জিতেওছি অনেকবার!"



চকোলেট উপহার দিয়ে লতাকে অনুষ্ঠান করতে রাজি করিয়েছিলেন ওয়াহিদা

এতগুলো গল্প শোনানোর একটাই কারণ। জীবনকে যে উপভোগ করতে জানতেন লতা, তার প্রমাণ দেওয়া। এবং সে জন্যই জীবনকে এত ভালবাসতেন তিনি। আরও বড় কথা, নিজেকে ভাল না বাসলে জীবনকে এভাবে উপভোগ করা যায় না। একাকিত্বের শূন্যতা যদি কখনও এসেও থাকে তাঁর জীবনে, তাকে তিনি ভরিয়ে রাখতেন সংগীত-সাধনা আর নিজের সব শখ-আহ্লাদ দিয়ে। আর ছিল পরিবারের ভালবাসা, ভক্তদের শ্রদ্ধা। সব মিলে পরিপূর্ণ জীবনযাপন করেছেন লতা মঙ্গেশকর।

তবে এ সব কিছুর উপরে ছিল তাঁর নিজস্ব জীবনদর্শন- যে খুশি খুঁজে নিতে হয় নিজের ভিতর থেকে। সম্পূর্ণতার বীজ লুকিয়ে থাকে নিজের মধ্যেই। তাকে খুঁজে বের করে জল দিতে হয় কেবল! সংগীতে তিনি কিংবদন্তি, অগুনতি মানুষের অনুপ্রেরণা। কিন্তু আমরা যারা এই মিলেনিয়াল যুগের ছা-পোষা মানুষ, জীবনের ইঁদুরদৌড়ে ক্লান্ত- তাদের কাছে লতার এই জীবনদর্শনও কি অনুপ্রেরণা নয়? নিজের গোটা জীবন দিয়ে এটাই তো শিখিয়ে গেলেন তিনি... নিজেকে ভালবাসুন, মূল্য দিন। অন্য কারও উপর নির্ভর না করে নিজের আশপাশ থেকেই খুঁজে নিন টুকরো-টুকরো খুশি। পাশাপাশি ভালবেসে আপন করে নিন সকলকে। দেখবেন, কোনও একাকিত্ব, দুঃখ, যন্ত্রণা আপনাকে ছুঁতেও পারবে না!

ছবি: আনন্দবাজার আর্কাইভ, সোশ্যাল মিডিয়া, ইন্টারনেট

...মেরা সায়া সাথ হোগা

লতা মঙ্গেশকর

মধুরিমা সিংহ রায় এবং সায়নী দাশশর্মা



*তিনি শত কোটি ভক্তের অনুপ্রেরণার উৎস। সুরসম্রাজ্ঞী **লতা মঙ্গেশকর** স্মরণে সেই অনুপ্রেরণার কথা, অনুভূতির কথাই ভাগ করে নিলেন সংগীত জগতের মহারথীরা। চার শিল্পীর সাক্ষাৎকারে মধুরিমা সিংহ রায় এবং লিখেছেন সায়নী দাশশর্মা।*



সত্যিই তাই! তাঁর প্রতিটি গানের কথায়, প্রত্যেকটা সুরের মূর্ছনায়, তিনি সদাবিরাজমান। তাঁর নশ্বর শরীর আজ মহাশূন্যে চিরবিলীন হয়ে গিয়েছে হয়তো, কিন্তু তাঁর যে সৃষ্টি তিনি রেখে গিয়েছেন, তা চিরন্তন। প্রায় আট দশকের কাছাকাছি সময় ধরে তিনি শ্রোতাদের মনের যতটুকু অংশে ছিলেন, আজও তা কোনও অংশে এতটুকু কম নয়। আজও তিনি শত শত ভক্তদের অনুপ্রেরণার উৎস, জীবনের পাথেয়। শুধু জনসাধারণ নয়, আধুনিক সংগীত জগতের মহারথীরাও নিজের মতো করে জীবনের আদর্শ করে নিয়েছেন লতাকে। তাঁর গায়কি, সুর তোলার ভঙ্গি, স্বরের কারুকাজ, সঙ্গীতের প্রজ্ঞা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন একাধিক প্রজন্মের শিল্পী।

কবিতা কৃষ্ণমূর্তি



লতাদিদি সবসময় আমার জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। ছোটবেলায় যেদিন থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম গান কী, যখন বাড়িতে সারাদিন প্রায় রেডিয়ো চলত, তখনই মনে হত কোনও একজন 'এঞ্জেল' বোধহয় রেডিয়োর ভিতরে বসে আছেন! হিন্দিতে কী সুন্দর সুন্দর গান গাইছেন তিনি! আমার মা বলতেন, উনি সাদা শাড়ি পরেন, তাই আমার কাছে উনি হয়ে উঠলেন 'হোয়াইট এঞ্জেল'। যখনই ওঁর গান শুনতে পেতাম, প্রায় আঠার মতো আটকে থাকতাম রেডিয়োতে। মাঝেমাঝে কাগজ-কলম নিয়ে গানের কথাও লিখতে বসে যেতাম। সেসময়ে তো টিভি বা ইউটিউব ছিল না। রেডিয়োই ছিল গান শোনার মূল উৎস। পরে মুম্বইতে কলেজে পড়াকালীন যখন প্লেব্যাক সিঙ্গার হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম, তখন বুঝেছিলাম ওঁর গান আমার জীবনে কত বড় ভূমিকা পালন করেছে। গানে আমার আগ্রহ জন্মানোর পিছনে ছোটবেলায় ওঁর শোনা গানগুলো ছিল।





লতাদিদির সঙ্গে প্রথমবার আলাপ হয় 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' সিনেমায়, মিউজিক ডিরেক্টর ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। স্টুডিওতে ঢুকে 'সখী ভাবনা কাহারে বলে'-র প্রথম চারটে লাইন শেখার পরে দেখলাম স্টুডিওর দরজা খুলে গেল। লতাজি ঢুকলেন। তখন বুঝলাম, আমায় ওঁর সঙ্গে গাইতে হবে! স্বভাবতই নার্ভাস লাগছিল। দেখলাম, পাশাপাশি দু'টো মাইক রাখা আছে। রিহার্সালের সময়ে লাইন ভুলে যাচ্ছিলাম প্রায়। শি ওয়াজ় ভেরি জেন্টল। স্টুডিও থেকে বেরনোর সময়ে আমায় হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথাও ড্রপ করে দেব?' আমি বললাম, ট্যাক্সি নিয়ে নেব। হেমন্তদার সৌজন্যে এত ভাল একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার। লেট সেভেন্টিজ়ে লক্ষ্মীকান্ত-পেয়ারেলালজির সুরে ডাবিং করছিলাম। শুটিংয়ের জন্য আমি গাইতাম, তারপর ফাইনাল ভার্শন লতাজি গাইতেন। তখন প্রচুর শিখেছি। লতাজি আমার জন্য এনসাইক্লোপিডিয়া। যখন আমি ফিল্মফেয়ার পুরস্কার পেলাম, সেবার লতাজিও লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার পেয়েছিলেন। উনি ওঁর স্পিচে আমার কথা বলেন। ওই কথাগুলো আমার কাছে সবচেয়ে বড় পুরস্কার। অসম্ভব নম্র, দয়ালু একজন মানুষ। একজন মানুষের যাবতীয় সদগুণ ছিল ওঁর মধ্যে। সফট স্পোকেন, জেন্টল, শাই স্মাইল, সোনায় বাঁধানো গলা, প্রফেশনালিজ়ম, এলিগ্যান্স...এত গুণের সমন্বয় একজন মানুষের মধ্যে। আমি বরাবর ওঁকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করি, সারাজীবন আমার মনে উনি স্পেশ্যাল জায়গা জুড়ে থাকবেন।



লতাজি সকলের কাছেই ইন্সপিরেশন। আমাদের দেশে পুরুষ বা মহিলা কণ্ঠশিল্পী সকলেই ওঁকে গুরু মানেন। আমি সবসময় বলি, উনি আমাদের 'সাইলেন্ট গুরু'। হয়তো কখনও সামনে বসে শিখিনি কিছু, কিন্তু ওঁকে শুনে শুনে যা শিখেছি তা অনেক। আমার এক বন্ধু সম্প্রতি বলল যে, লতাজি ছিলেন ফ্রি কস্ট অফ এডুকেশন। শুধু শুনে শুনেই এতকিছু শিখেছি, অন্য কোনও শিল্পীর থেকে বোধহয় পাইনি। ভয়েস থ্রো, ভয়েস মডিউলেশন, কীভাবে নিজের কণ্ঠকে কোথায় ব্যবহার করছেন, এসবই ওঁর থেকে শেখার। এরপর যখন নিজে গাইবার সুযোগ পেলাম, তখন ওঁর থেকে যা শিখেছিলাম সেগুলোই নিজের মতো করে নিজের গানে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। যদিও ওঁর ১০ শতাংশও অ্যাচিভ করা মুশকিল! ওঁর 'তৈয়ারি', ওঁর গলার রেঞ্জ- সবমিলিয়ে একজন অবিস্মরণীয় শিল্পী। আমি অন্য শিল্পীদেরও বড় ফ্যান, কিন্তু লতাজি একেবারেই আলাদা। আমি সৌভাগ্যবান, ফোনে একাধিকবার লতাজির সঙ্গে কথা বলেছি। দেখাও হয়েছে। ভেরি ওয়র্ম পার্সন। আমাকে দেখে চিনতে পেরে আমার প্রশংসা করেছিলেন।



উনি বলেছিলেন, এখন যাঁরা গান করেন, তাঁর মধ্যে আমি ওঁর অন্যতম প্রিয়। আমার কাছে বড় কমপ্লিমেন্ট এটি। একটা ঘটনার কথা বলি। একবার লতাজির সঙ্গে কথা বলতে বলতে প্রায় বাকরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম। আমি বললাম, "আমি তো ভাবতেই পারছি না যে, আপনার সঙ্গে কথা বলছি।" উনি বললেন, "আমিও তোমার মতোই একজন সাধারণ মেয়ে।" সাত-আটবছর আগের কথা। খুব সিম্পল মানুষ ছিলেন এর থেকেই বোঝা যায়। ওঁর সব গানই প্রিয়। কোনও একটা প্রিয় গান বেছে নেওয়া অসম্ভব। 'লগ জা গলে', 'তুমহে ইয়াঁদ করকে জায়েগি রয়ন সারি' (আম্রপালী), 'কুছ দিল নে কহাঁ' (অনুপমা), 'হম নে দেখি হ্যায় উন আঁখো কি' (খামোশি) খুব প্রিয়। মরাঠি সঙ্গীতজগতে ওঁর অবদানের কোনও তুলনা নেই। বাংলাতেও একই কথা প্রযোজ্য। কিছুদিন আগে দুর্গাপুজোয় শো করেছিলাম বাংলায়, তখন জানতে পারি এত অসংখ্য গান গেয়েছেন বাংলাতেও। 'রজনীগন্ধা', 'ও সজনা', 'না জিয়া লাগে না'...হিন্দি-বাংলা দুটো ভার্শনই খুব প্রিয়।



প্রিয় শিল্পীকে হারানোর পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় আবেগঘন পোস্ট দেন শ্রেয়া ঘোষাল। শ্রেয়া লেখেন, খবরটা শোনার পর থেকে নিজেকে স্থির রাখতে পারছিলেন না। এতটাই কাছের তাঁর কণ্ঠস্বর! শ্রেয়া বলেন যে, ছোটবেলার কথা তাঁর খুব মনে পড়ছে। "হাসি, কান্না, জয়, পরাজয়, সুখ, দুঃখের প্রতিটা মুহূর্ত কেটেছে ওঁর গান শুনে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ওঁর গান শুনতাম, গলার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজ, ভঙ্গি শেখার জন্য, অভিব্যক্তি বোঝার জন্য। সেখান থেকেই লতাজির সঙ্গে আমার প্রাণের যোগ।" লতার গাওয়া প্রথম গান যেটা শ্রেয়া গেয়েছিলেন তা হল 'হায়ে জিয়া রোয়ে'। গানের প্রতিযোগিতায় গাওয়া ওঁর 'সুনিয়ো জি' গেয়ে নজরে এসেছিলেন অনেকের। আর তাঁর প্রথম প্লেব্যাক 'দেবদাস'-এর অডিশনে গেয়েছিলেন 'জীবন ডোর তুমহি সঙ্গ'। এক সাক্ষাৎকারে শ্রেয়া জানিয়েছেন লতাজির সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হওয়ার মুহূর্তের কথা। একটি রেকর্ডিং স্টুডিয়োতে দেখা। "আমার যিনি সংগীত পরিচালক ছিলেন, তিনি জানতেন ওই মুহূর্তটা আমার কাছে কতটা স্পেশ্যাল। তাই উনি রেকর্ডিং থামিয়ে দিয়ে জানিয়েছিলেন, লতাজি এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু ছেড়ে দৌড়ে গিয়েছিলাম নীচে। ধবধবে সাদা াড়ি আর হিরের গয়নায় বসেছিলেন আমার অনুপ্রেরণা, মুখে সলজ্জ হাসি। এতখানি 'অরা' ছিল ওঁর যে, কয়েক

শাড়ি আর হিরের গয়নায় বসেছিলেন আমার অনুপ্রেরণা, মুখে সলজ্জ হাসি। এতখানি 'অরা' ছিল ওঁর যে, কয়েক মুহূর্ত মুখ থেকে কোনও আওয়াজ বেরোয়নি। সেদিন থেকে যতবার দেখা হয়েছে, প্রতিবার আশীর্বাদ করেছেন আমায়। সত্যি বলতে, আজ পর্যন্ত যা শিখেছি, সবই ওঁর গান শুনে।" পারফেকশনের সমার্থক ছিলেন উনি। আজও 'রসমে উলফত' বা 'মায়ে রি ম্যায় ক্যায়সে কহুঁ' শুনলে চোখে জল আসে শ্রেয়ার। লতাজি তাঁর প্রতিটা গানে সেই প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতেন। সেই কারণেই বোধহয় লতাজির চলে যাওয়াটা খুব ব্যক্তিগত মনে হচ্ছে শ্রেয়ার। লতাজি তাঁর শিক্ষক ছিলেন, আজীবন থাকবেন। "আমার এতটাই কাছের মানুষ ছিলেন যে, মনে হচ্ছে যেন ওঁর সঙ্গে আমার একটা অংশও মুছে গিয়েছে জীবন থেকে।"

শিল্পা রাও



লতা মঙ্গেশকরজি গানের একজন 'ইনস্টিটিউশন'। হার কানেকশন উইথ মিউজ়িক ওয়াজ় ইটার্নাল। এত যুগ ধরে লতাজি কী গেয়েছিলেন, তা থেকেই আমরা শিখে চলেছি। সেভাবেই সঙ্গীতের অভ্যেস করে চলেছি। উনিও সারাজীবন সঙ্গীতের সাধনা করে গিয়েছেন। প্র্যাকটিসের মধ্যে দিয়ে এক অদ্ভুত সুন্দর সংযোগ তৈরি হয় গানের সঙ্গে। যত আপনি শিখবেন, প্র্যাকটিস করবেন, তত এই সংযোগ দৃঢ় হবে। দিস ইজ় হোয়াট শি স্ট্যান্ডস ফর। গানের শিক্ষা যে কতটা জরুরি, তা তরুণ শিল্পীদের লতাজির থেকে শেখা প্রয়োজন। ছোট থেকেই লতাজির গান শুনে বড় হয়েছি। আমার ব্যক্তিগত পছন্দের 'লগ জা গলে'।



২০১২-তে সোনু নিগমের সঙ্গে 'ক্লোজ় টু মাই হার্ট' কনসার্ট টুরের শুরুতে এই গানটাই গেয়েছিলাম। এই কনসার্ট আর এই গানের মাধ্যমেই বলিউডে আমার জার্নি শুরু হয়, তাই এই গানটা খুব স্পেশ্যাল। ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, একবার ওঁর সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। এত শান্ত স্বভাবের একজন মানুষ! সাচ আ কাম পার্সোনালিটি। ওঁর কাজই ওঁর ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। যদি ওঁর কোনও গান রিক্রিয়েট করার কথা বলেন, তাহলে বলব 'পাকিজ়া'র পুরো অ্যালবামটিই গাইতে চাইব। প্রতিটা গানই কী অসম্ভব সুন্দর আর জীবন্ত...

কবিতা শেঠ



আমি উত্তরপ্রদেশের বরেলিতে বড় হয়েছি। ছোটবেলায় আমার রুটিনই ছিল স্কুল থেকে ফিরে রেডিয়োতে লতাজির গান শোনা। ভারতে যতজন সঙ্গীতশিল্পী বা মিউজ়িশিয়ান আছেন, তাঁদের সকলের জন্যই উনি অনুপ্রেরণা। সকলে ওঁকে মা সরস্বতী বলেন, উনি সত্যিই তাই ছিলেন। এখনও আমি যখন গান গাই, ওঁকে ভেবেই গাই। ভাবার চেষ্টা করি, উনি গাইলে কীভাবে গাইতেন। ভাবতে পারছেন, একজন মানুষের ৮০ বছরের দীর্ঘ কেরিয়ার! আমরা যাঁরা গানবাজনা করি, তাঁদের খাওয়া-ব্রাশ করার মতো রোজকার রুটিনেই লতাজির গান শোনাও থাকে। ওঁর জীবনই আমাদের কাছে অনুপ্রেরণা। ভারত যখন বিশ্বকাপ জিতে এসেছিল ১৯৮৩ সালে, তখন বিসিসিআই-এর কাছে পয়সা ছিল না খেলোয়াড়দের সম্বর্ধনা দেওয়ার। উনি বিনা পয়সায় পারফর্ম করেছিলেন। যখন ২০০৫-এ মুম্বইতে শিফট হই, তার এক-দেড় মাসের মধ্যে একটি অ্যাওয়ার্ড ফাংশনে আমি নমিনেটেড হয়েছিলাম। গানের জগতের সব দিকপালরা ছিলেন সেদিন। লতাজি, আশাজি, উষাজি সকলে ছিলেন। এক ছাদের নীচে এতজনকে চোখের সামনে দেখে বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না! লতাজির পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নিয়েছিলাম সেদিন। মুম্বই শিফট হওয়ার পরেই লতাজির আশীর্বাদ পেয়ে গেলাম, আর কী চাই! এরপরে এক-দুবার এরকম অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছে। উনি আমার কাছে আইডল। সবসময় মনে হয়, ওঁর মতো আমারও যেন সুর ঠিক লাগে। মদন মোহনজির সুরে ওঁর গাওয়া গানগুলো আমার খুব পছন্দের। সন্ধের দিকে একটু ফাঁকা সময় থাকলে আমি ওঁদের জুটির গান শুনি।



'আপকি নজ়রো নে সমঝা' গানের দৃশ্য

'আপ কি নজ়রোঁ নে সমঝা', 'তু জাঁহাঁ জাঁহাঁ চলেগা', 'অ্যায় মেরে ওয়াতন কে লোগোঁ' আমার প্রিয়। 'আল্লা তেরো নাম'ও প্রিয়। ভজন, গজ়ল, রোম্যান্টিক, স্যাড সং যা-ই গেয়েছেন তাকেই জীবন্ত করে তুলেছেন। অমর করে দিয়েছেন। গজ়ল গাওয়ার জন্য উর্দু শিখেছিলেন, বাংলা শিখেছিলেন বাংলা গান গাওয়ার জন্য। উনি সবসময় শিখতে চাইতেন। মাইকে উচ্চারণের কায়দাও আলাদা ছিল। সারাজীবন ধরে লতাজিকে শুনলেও বোধহয় আশ মিটবে না...

নানা প্রজন্মের শিল্পীরা তাঁকে আদর্শ করেই এগিয়েছেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মও হয়তো তাই করবে। পুরুষ-মহিলা শিল্পী নির্বিশেষে আদি-অনন্তকাল ধরে হয়তো এই ধারাই চলবে। লতা চিরন্তন...

স্বাতন্ত্র্যে চিরন্তন

লতা মঙ্গেশকর

সায়নী দাশশর্মা এবং মধুরিমা সিংহ রায়



তাঁর গানের মতোই চিরকালীন তাঁর সাজসজ্জার ধরন। সংগীতের মতো পবিত্র, তাঁর কণ্ঠস্বরের মতোই মাধুর্যে ভরা। শাড়ির রং থেকে গয়না নির্বাচন, হেয়ার স্টাইল, সবেতেই এক অভাবনীয় পরিমিতিবোধ, যা সময়ের তরণী বেয়ে পরিণত হয়েছে ***লতা মঙ্গেশকরের*** *'স্টেটমেন্ট'-এ। এই স্টেটমেন্টই সুরের সম্রাজ্ঞীকে উত্তীর্ণ করেছে চিরন্তন 'ফ্যাশন আইকন'-এর পর্যায়ে। সংগীতের প্রতি তাঁর যে-নিষ্ঠা ছিল আজীবন, ততটাই তিনি একনিষ্ঠ ছিলেন সাজপোশাকের ক্ষেত্রে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বদলানোর পরিবর্তে বাহ্যিক বেশভূষাকে নিজের ব্যক্তিত্বের পরিপূরক করে তুলেছেন। প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, এভাবেও ফ্যাশন-আদর্শ হয়ে ওঠা সম্ভব! কিংবদন্তি লতা মঙ্গেশকরের 'টাইমলেস স্টেটমেন্ট' ফিরে দেখলেন সায়নী দাশশর্মা এবং মধুরিমা সিংহ রায়। সঙ্গে রইল তাঁর সাজপোশাকের 'কলকাতা অধ্যায়'-এর কিছু স্মৃতি।*



অসামান্য গায়িকা, বিস্ময়কর প্রতিভা, দেবী সরস্বতীর আশিসধন্যা... আপামর জনসাধারণের কাছে শিল্পী লতা মঙ্গেশকরের প্রাথমিক পরিচিতি এগুলোই। কিন্তু যে-বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যক্তি লতা মঙ্গেশকরকে আর-সকলের চেয়ে আলাদা করে, তার মধ্যে অন্যতম তাঁর ফ্যাশন সেন্স। আপাতভাবে যা সাধারণ, তাও যে এত অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে, স্টেটমেন্ট তৈরি করতে পারে, 'ফ্যাশন আইকন'-এর পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে একজন মানুষকে, তার জীবন্ত উদাহরণ লতা মঙ্গেশকর। তাঁর সাজগোজ, শাড়ি পরার ধরন, গয়না বা হেয়ারস্টাইলের বিশেষত্ব একটাই। প্রতিটাই টাইমলেস। অবশ্য এই ফ্যাশন-আদর্শের নেপথ্যে তাঁর ব্যক্তিসত্তার প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। বিনোদন জগতের অন্যতম কাণ্ডারি ছিলেন, কিন্তু জাঁকজমক, গ্ল্যামার থেকে তিনি চির-বিমুখ। প্রথমজীবনে অভিনয় করেছেন, কিন্তু ক্যামেরার সামনে সেজেগুজে দাঁড়াতে একেবারেই পছন্দ করতেন না। সেই অপছন্দবোধ, অস্বাচ্ছন্দ্যবোধই তাঁর ব্যক্তিত্বকে পূর্ণতা দিয়েছে যেন! যে-পরিমিতিবোধ তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তা-ই স্বতন্ত্র করে তুলেছে তাঁর ব্যক্তিত্বকেও।



সাজগোজে কোনও বাহুল্য নেই। সাদা শাড়ি, উজ্জ্বল পাড় আর হালকা হিরের গয়নাতেও কী অসম্ভব দ্যুতি ছড়াতে পারেন একজন মানুষ! জরির পাড়ের অফ হোয়াইট শাড়ি পরে মঞ্চে উঠলে পুরো স্পটলাইট নিমেষে তিনিই শুষে নেন। আশেপাশে যিনিই থাকুন না কেন, মধ্যমণি তিনিই। এমনই 'অরা' ছিল লতা মঙ্গেশকরের। পাড়ওলা শাড়ি দু'কাঁধের উপর দিয়ে জড়ানো, গোল টিপ আর দুই বিনুনি...এই সিগনেচার স্টাইল ধরে রেখেছিলেন বছরের পর বছর। কখনও তা পালটানোর প্রয়োজন হয়নি, কখনও প্রয়োজন হয়নি ইমেজ-মেকওভারের। কারণ, তিনি বরাবরই স্বতন্ত্র। তা সে সাংগীতিক পাণ্ডিত্যে হোক বা স্টাইল স্টেটমেন্টে। আর তাঁর শাড়ি-বিনুনির কম্বিনেশন কোথাও গিয়ে তাঁর গলার স্বর, গায়কির ধরনেরও পরিপূরক ছিল। সবকিছুই ভীষণ ক্লাসি, ভীষণ এলিগ্যান্ট। ন'বছর বয়সে প্রথমবার লতার বাবা তাঁকে অনুমতি দেন তাঁর সঙ্গে মঞ্চে গাইতে। সেদিন তিনি পরেছিলেন সাদা ফ্রক। সেই শুরু সাদার সঙ্গে তাঁর চিরন্তন ভাব-ভালবাসার। ২০১৩ সালে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, একবার রঙিন শাড়ি পরার জন্য কোরাস গার্লরা নাকি তাঁকে নিয়ে খুব হাসাহাসি করেছিলেন! তারপর আর তিনি রঙিন শাড়ি পরে মঞ্চে আসেননি। তবে সাদাও যে এত রঙিন হতে পারে, ব্যক্তিত্বকে এত নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে, তা বারবার প্রমাণ করেছেন লতা মঙ্গেশকর। হ্যান্ডলুমের শাড়ি

চিরপ্রিয় ছিল। তাঁত, সিল্ক, লখনউ চিকন, সব ধরনের শাড়িই ভালবাসতেন। জমিতে কখনও থাকত সাদা, কখনও অফ-হোয়াইট, কখনও ক্রিম। তার উপর কোথাও ফুল-লতাপাতা, কখনও দেখা গিয়েছে সূক্ষ্ম জরির বুনোট। রং থাকত শাড়ির আঁচলে, পাড়ে। মাত্র একবার নাকি লাস ভেগাসে গিয়ে আকাশি সালোয়ার-কমিজ পরেছিলেন। শোনা যায়, শাড়ির প্রতি ভালবাসায় তাঁকে সঙ্গ দিতেন অভিনেত্রী নার্গিস। লখনউয়ের শাড়ি বিক্রেতারা সেইসময় নিত্যযাতায়াত করতেন এক বাড়ি থেকে আর-এক বাড়ি। আর ভালবাসতেন গয়না। হিরে লতার সবচেয়ে পছন্দের রত্ন। একাধিক সাক্ষাৎকারে কিংবদন্তি বলেছেন, "ছোটবেলা থেকেই গয়না ভালবাসতাম। কিন্তু তখন কেনার সামর্থ্য ছিল না। ভাবতাম যদি কখনও গয়না পরি, তাহলে হিরেই পরব। মনে আছে, প্রথম উপার্জন দিয়ে মায়ের জন্য একজোড়া সোনার কানের দুল কিনেছিলাম। আর নিজের জন্য গড়িয়েছিলাম চুনি বসানো হিরের একখানি আংটি, ৭০০ টাকা দিয়ে।" তাতে খোদাই করা ছিল তাঁর নামের আদ্যাক্ষর 'এল এম'। সমস্ত গয়নার মধ্যে ওটিই যে তাঁর মনের সবচেয়ে কাছের, তাও স্বীকার করেছেন কিন্নরকণ্ঠী।

এরপর হিরের প্রতি তাঁর দুর্বলতা বেড়েছে বই কমেনি। এদেশের অনেকের কাছেই তিনি রীতিমতো ডায়মন্ড এক্সপার্ট। সোনার গয়নাও ভালবাসতেন। কিন্তু হিরের প্রতি তাঁর ভালবাসা সোনার জেল্লাকেও হার মানিয়েছে। একবার একটি ডায়মন্ড এক্সপোর্ট কম্পানির হয়ে পাঁচটি হিরের গয়না ডিজ়াইন করেছিলেন লতা মঙ্গেশকর। 'স্বর্ণাঞ্জলি' নামে সেই গয়নার কালেকশন বিক্রির টাকা অনুদানস্বরূপ তুলে দেওয়া হয় কিছু সংস্থার হাতে। মেক-আপের সঙ্গে তাঁর কোনওকালেই সখ্য ছিল না। যতবারই পাবলিক অ্যাপিয়ারেন্সে এসেছেন, পরনে দেখা গিয়েছে হালকা রঙের শাড়ি, সঙ্গে শালের মতো করে কাঁধে ফেলা রঙিন আঁচল, কপালে টিপ, হাতে সোনা বা হিরের চুড়ি, গলায় সরু চেন-পেনডেন্ট, কখনও বা মুক্তোর হার এবং কানে হিরের দুল। এর বাইরে সাজ বলতে দু'দিকে লম্বা বিনুনি। কোমর ছাপানো চুলে এই সিগনেচার বিনুনি যেন তাঁর কিশোরীবেলার স্মারক! বিশেষ অনুষ্ঠানে কখনওসখনও চুলের সাজে স্থান পেত বেল, জুঁইয়েরা। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় একবার বলেছিলেন তাঁর এই বন্ধুর চুলের যত্নে লাগে পুরো একবাটি তেল। বয়সকালে অবশ্য খোঁপাতেও দেখা গিয়েছে শিল্পীকে। কিন্তু লতার ব্যক্তিত্ব বা শিল্পীসত্তার সঙ্গে হালকা রঙের শাড়ি, সলিটেয়ার আর বিনুনি যে রসায়ন, যে এলিগ্যান্স সৃষ্টি করত, তা সত্যিই চিরন্তন, তাঁরই মতো স্বতন্ত্র।



তবে যে কথা না বললেই নয়, তা হল, সাজপোশাকের আঙ্গিকে লতা মঙ্গেশকরের পরতে পরতে জড়িয়ে ছিল বাঙালিয়ানা। শাড়ি হোক বা গয়না, এই সূত্রে কলকাতার সঙ্গে বরাবরই খাস যোগাযোগ ছিল গায়িকার। কলকাতায় এলেই পৌঁছে যেতেন নিজের এই 'প্রিয়' দোকানগুলিতে। নিজের জন্য তো বটেই, তাছাড়া পরিবার-পরিজন, এমনকী ইন্ডাস্ট্রির প্রিয়জনদের জন্যও উপহার কিনে নিয়ে যেতেন। তেমনই দুই বিপণি ভাগ করে

নিলেন তাঁকে কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা, তাঁর পছন্দ-অপছন্দের কথা....

চিন্ময় বসু

কর্ণধার, মীরা বসু শাড়িজ়



মীরা ও চিন্ময় বসুর সঙ্গে লতা

প্রথমবার লতা মঙ্গেশকরজি আমাদের দোকানে এসেছিলেন ১৯৯২ সালে। সে এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা! ৮, ডা. শরৎ ব্যানার্জি রোডে আমাদের দোকান। তখন আমাদের পুরনো বাড়িতেই ছিল দোকান। সকালবেলা দোকান, আর রাতে বেডরুম...এরকম ছিল বাড়ির অবস্থা। একদিন বাইরে ডাইনিং টেবলে আমরা খেতে বসেছি রাত সওয়া ন'টা নাগাদ। হঠাৎই কলিংবেলের শব্দ। দরজা খুলেই আমি হতভম্ব! দেখলাম সামনে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং লতা মঙ্গেশকর আর আশা ভোঁসলে। কিছুক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকার পরে উনি জিজ্ঞেস করলেন, "অন্দর ভি আনে দোগে?" ওঁরা কোত্থেকে আমাদের খোঁজ পেলেন তা জানি না। ওঁরা যে আসবেন, তার কোনও ধারণাই ছিল না। তোষক সরিয়ে মোড়া পেতে শাড়ি দেখাতে শুরু করলাম। প্রথমে উনি বললেন, পনেরো মিনিট মতো থাকবেন। কিন্তু উনি উঠলেন পৌনে এগারোটা নাগাদ। গোলমরিচের একটি মিশ্রণ ছিল ওঁর কাছে, ওটাই বারতিনেক গরম করে খেলেন। এর দিন পনেরো-কুড়ি পরে সঞ্জীব গোয়েঙ্কাদের বাড়িতে কোনও এক পুজোয় ভজন গাইতে এসেছিলেন।



কলকাতায় মীরা বসু কালেকশন থেকে শাড়ি নিতেনই

তখন আবার একদিন হঠাৎ দুপুরবেলা উনি আর আশাজি আমাদের বাড়ি এসে হাজির। খুব ডাউন টু আর্থ, ছবিও তুললেন। অন্য ক্রেতারা এলেও বিরক্ত হচ্ছিলেন না। দু'জনে ১৭-১৮টা করে শাড়ি নিলেন ওঁদের 'হ্যান্ডস'-দের জন্য, সহশিল্পীদের জন্য। বেশিরভাগই হালকা রংয়ের শাড়ি। বললেন, "কলকাতা এলেই আপনাদের বাড়ি আসব।" এরপরে আশাজি একাও এসেছেন, লতাজির জন্য শাড়ি নিয়ে যেতেন। পরে লতাজির শরীর ভাল না

থাকায় উনি আমাদের বাড়ি আসতে পারেননি, আমরা শাড়ি নিয়ে তাজ বেঙ্গলে গিয়েছিলাম। মূলত অফ হোয়াইট নিতেন নিজের জন্য। সঙ্গে জরির পাড় ওঁর প্রিয় ছিল। লাল, মেরুন, কমলা পাড়ও খুব পছন্দের ছিল। সবুজ বা ডার্ক ব্লু রং পছন্দ করতেন না খুব একটা। পরের দিকে আরও টোনড ডাউন কালার নিতেন। যতবার উনি এসেছিলেন ততবার আমি উপস্থিত ছিলাম। মা (মীরা বসু) তো ছিলেনই প্রথমদিকে। 'প্রভুকুঞ্জ'-এ ওঁর বাড়ি যাওয়ারও সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। তবে আজ অবধি জানতে পারিনি, কোত্থেকে আমাদের সন্ধান পেয়েছিলেন ওঁরা! তার আগে রাখী গুলজ়ার এসেছিলেন, হতে পারে হয়তো ওঁর সূত্রেই জেনেছিলেন। কিন্তু কখনও তা জিজ্ঞেস করে উঠতে পারিনি।

শ্রী সরকার

বি. সরকার জহুরি



বি.সরকার পরিবারের সঙ্গে

লতাজির সঙ্গে বাবার আলাপ বহু পুরনো, ছয়ের দশকে। আমার বাবা বীরেশ্বর সরকার একাধারে যেমন স্বর্ণবিপণির কর্ণধার ছিলেন, তেমনই সংগীত পরিচালকও ছিলেন। একবার উনি লতাজির কাছে যান, পুজোর গান রেকর্ড করানোর জন্য। শুনে লতাজি বলেছিলেন, কোনও সিনেমার গান হলে তবেই তিনি রাজি হবেন। বাবারও জেদ চেপে যায়। তারপর বাবা 'সোনার খাঁচা'-র গল্পটা লেখেন। উত্তমকুমার আর অপর্ণা সেন অভিনীত ওই সিনেমায় প্রথম বাবার সঙ্গে লতাজি কাজ করলেন। গানটা ছিল 'বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি'। সেই থেকেই বাবার সঙ্গে আলাপ, পরিচয়। তারপর থেকে বহুবার উনি দোকানে এসেছেন, অনেকবার বাবাই ওঁকে এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে আসতেন। আমাদের বাড়িতেও যাতায়াত ছিল। আর আমরা তো যেতামই বম্বেতে, ওঁর বাড়ি প্রভাকুঞ্জে। একবার লতাজির আমাদের দোকানে আসা নিয়ে খুব মজার একটা ঘটনা ঘটে। বাবা সাধারণত যখন দোকানে যেতেন, তখন শার্ট-প্যান্ট পরতেন। কিন্তু রেকর্ডিংয়ের কাজে বা অন্যান্য সময় ধুতি পরতেন। একবার লতাজি হঠাৎ কলকাতায় এসেছেন। কিছু না বলেই দোকানে গিয়ে হাজির। বাবাও ওঁকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন! মজার বিষয় হল লতাজি প্রথমটায় বাবাকে ওই পোশাকে দেখে চিনতেই পারেননি। বাবাও অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে পোশাক বদলে আবার যান। এই ঘটনাটা বাবা বরাবর খুব চেরিশ করতেন।



বীরেশ্বর সরকারের সঙ্গে গানের রেকর্ডিংয়ে

গয়না পছন্দ-অপছন্দের কথা প্রসঙ্গে বলি, লতাজির চয়েস, ওঁর ড্রেসিং সেন্সে সাংঘাতিক গ্রেস, অসম্ভব এলিগ্যান্স রয়েছে। খুব সাধারণ, কিন্তু তবুও অসামান্য। মানুষ হিসেবেও প্রচণ্ড শৌখিন ছিলেন। উনি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন হাতের গয়না। বাংলার কাজের মধ্যে কত ধরনের বালা, চুড়ি, চুড় যে ছিল ওঁর কালেকশনে! সোনার হার, চেন বা কানের গয়না সেভাবে নিতেন না। আর হিরে ছিল সবচেয়ে দুর্বলতার জায়গা! প্রচুর আংটি, চুড়ি, কানের দুল কিনেছেন আমাদের কাছ থেকে। সাতটা পাথর দেওয়া বড় বড় ক্লাস্টার্স খুব কিনতেন। পরের দিকে যখন কলকাতায় আসতেন, তখন আর দোকানে আসতে পারতেন না। আমরা গয়না নিয়ে যেতাম গ্র্যান্ডে বা তাজে। ওঁর সঙ্গে ওঁর বোনেরা থাকতেন। আশাজি, মিনা আন্টি, মিনা আন্টির মেয়ে রচনা। ওঁরাও বহুবার গয়না কিনেছেন আমাদের থেকে। আসলে লতাজিরা প্রায় আমাদের পরিবারই ছিলেন। এত ঘরোয়াভাবে ওঁদের সঙ্গে মিশেছি, তখন বুঝতামও না যে কার সঙ্গে দেখা করছি! আমায় 'বসন্তি' বলে ডাকতেন। বাবা চলে যাওয়ার পর মাকে (সতী সরকার) প্রথমবার দেখে উনি খুব শকড হয়েছিলেন। মায়ের সঙ্গেও লতাজির প্রচুর স্মৃতি। মাঝে মায়ের কোভিড হয়, তখনও নিয়মিত খোঁজ নিতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে গল্প করতেন দু'জনে। মায়ের কত শাড়ি রয়েছে লতাজির দেওয়া। আমাদেরও জামা-কাপড় কিনে দিয়েছেন বহুবার। ২০০৫ নাগাদ, বাবা চলে

যাওয়ার পর, বাবার কিছু অপ্রকাশিত গান উনি রেকর্ড করিয়ে রিলিজ় করেন। অ্যালবামটার নাম ছিল 'ওরে মন মন আমার'। বলেছিলেন, "প্রায় ২০ বছর পর আবার বাংলা গান গাইছি"। এই ভালবাসার টান, এই ঋণ সত্যিই কখনও মিটবে না। আমার সঙ্গে ওঁর শেষ দেখা হয় সম্ভবত ২০১৬ সালে। শেষবার হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগেও মায়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। তখনও জানতাম না, ওটাই শেষ ফোনকল। আমাদের কাছে যে উনি ঠিক কী ছিলেন, কতটা আপন ছিলেন, সত্যিই বলে বোঝাতে পারব না!

অর্চনা আগরওয়াল

জুয়েলরি ডিজ়াইনার



হিরে এমন একটা রত্ন, যা কখনও পুরনো হওয়ার নয়। ট্র্যাডিশনাল, আবার ভীষণ আধুনিকও। ঠিক লতাজির মতো। এত আটপৌরে সাজতেন, তবুও তা সময়োপযোগী। কখনওই 'আউট অফ ফ্যাশন' হওয়ার নয়। উনি সবসময় স্বীকার করে এসেছেন যে, গানের পর তাঁর দ্বিতীয় ভালবাসা হিরেই। প্রথম উপার্জনের টাকা দিয়েও উনি হিরের আংটি কিনেছিলেন। এছাড়া একটি সংস্থার জন্য একবার কিছু হিরের গয়না ডিজ়াইনও করেছিলেন। আমরা সকলেই লতা মঙ্গেশকরকে তাঁর কণ্ঠের জন্য চিনি। কিন্তু অনেকেই জানেন না যে, উনি ফ্যাশন নিয়েও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। কোন শাড়ি পরবেন, কী গয়না বাছবেন, এসব কিছুর পিছনেই প্রচুর ভাবনাচিন্তা জড়িয়ে থাকত। আর হিরে তো ভীষণ ভার্সাটাইলও! চিরন্তন ডিজ়াইনেও যতটা নজরকাড়া, আধুনিক রূপেও ততটাই অভিনব। সব ধরনের পোশাকের সঙ্গে মানায়। তাছাড়া লতাজি যে ধরনের গয়না পছন্দ করতেন, যেমন সলিটেয়ার কিংবা সিম্পল টপস, সেগুলো তো ক্ল্যাসিক পিসেস। কোনও তুলনাই হয় না!



সবমিলিয়ে লতা মঙ্গেশকরের স্থিতধী ব্যক্তিত্ব, তাঁর স্টাইল স্টেটমেন্টের সঙ্গে কোথাও যেন সমার্থক। সাদা জমি, রঙিন পাড়ের দীপ্তিতে তিনি সদা-উজ্জ্বল। তাঁর পোশাকে, রুচিতে উপচে উঠত এক অমোঘ আভিজাত্য। আবার সারল্যও। সবমিলিয়ে তিনি নিজেই যে এক চিরন্তন ফ্যাশন আইকন...

বাঙালির আত্মার আত্মীয়

লতা মঙ্গেশকর

ইন্দ্রাণী ঘোষ



আনমনে

*গানের সূত্রেই বাংলার সঙ্গে **লতা মঙ্গেশকরের** তৈরি হয়েছিল গভীর সংযোগ। কিন্তু নিছক গানেই আবদ্ধ থাকেনি তা। বাংলার সংস্কৃতি নিয়ে তাঁর ভালবাসার গল্প শোনালেন ইন্দ্রাণী ঘোষ।*

তখন পাঁচের দশকের শেষভাগ। তুমুল ব্যস্ত লতা মঙ্গেশকর। মাত্র আগের দশকের শেষভাগে কেরিয়ার শুরু করে ইতিমধ্যেই তিনি হয়ে উঠেছেন বলিউডের তাবড় সংগীত পরিচালকদের নয়নের মণি, তাঁদের প্রথম পছন্দ। এরই মধ্যে বাংলা গান গাওয়ার আর্জি এল তাঁর কাছে। আরব সাগরের তীরে তখন বাঙালিদেরই রমরমা। লতাও এর মধ্যে শচীন দেব বর্মণ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরীর সঙ্গে হিন্দিতে কাজ করে ফেলেছেন। পাঁচের দশকের শেষে তাঁর কণ্ঠে প্রথম শোনা গেল বাংলা গান। লতার হিন্দি গানে আগেই মুগ্ধ হয়েছিল বাঙালি, এবার তাঁর বাংলা গানেও সেই মুগ্ধতার রেশ ছড়িয়ে গেল সমানভাবে। বাংলা ভাষায় যদি সাবলীলভাবে গাইতেই হয়, তাহলে বাংলা শেখা অত্যন্ত জরুরি। নয়তো যে উচ্চারণে থেকে যাবে ত্রুটি, ভাষার অনায়াস চলন বাধাপ্রাপ্ত হবে! এদিকে গান, তার প্রতিটি শব্দের নিখুঁত উচ্চারণ নিয়ে লতা মঙ্গেশকরের খুঁতখুঁতানি সর্বজনবিদিত। অথচ মরাঠি কন্যা যে বাংলা জানেন না! তাহলে উপায়? মুশকিল আসান করলেন লতা নিজেই। ওই চরম ব্যস্ততার মধ্যেই কথা হল আর বাঙালি পরিচালক বাসু ভট্টাচার্যের সঙ্গে। বাসুর কঠোর তত্ত্বাবধানে শিখতে লাগলেন বাংলা। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, লতা বাংলা উচ্চারণ তো বটেই, এমনকী ভাষাটাকেও রপ্ত করে ফেলেছেন! বলতে না পারলেও দিব্যি বুঝতে পারছেন বাংলা!



একমঞ্চে: হেমন্ত-লতা

নাড়ির টানে...

গানের সূত্রে বাংলার সঙ্গে লতা মঙ্গেশকরের যোগাযোগ হলেও সেই যোগ নাড়ির টানের চেয়ে কিছু কম ছিল না। লতা বারংবারই নিজের সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, অন্যান্য ভাষার চেয়ে বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর ঝোঁক বরাবর বেশি। কিন্তু কীভাবে এল সেই স্বভাবগত ঝোঁক? এ প্রসঙ্গে এক অদ্ভুত গল্প শোনা যায়। লতার বাবা দীননাথ মঙ্গেশকর ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত। লতার জন্মের আগে বিবেকানন্দের ছবি ঘরে টাঙিয়ে নাকি দীননাথ তাঁর রচনা পাঠ করতেন। লতার কথায়, "হয়তো গর্ভাবস্থাতেই বাংলার সঙ্গে তাই আমার আত্মিক যোগ তৈরি হয়ে গিয়েছিল!" কাকতালীয়ভাবে, কিশোরী লতা যখন পা রাখতে যাচ্ছেন সাগরপাড়ের ইন্ডাস্ট্রিতে, তখনও কিন্তু তাঁর প্রথম প্রত্যাখ্যান এসেছিল এক বাঙালির কাছ থেকেই। তিনি 'ফিল্মিস্তান'-এর প্রযোজক শশধর মুখোপাধ্যায়। তবে কেরিয়ারের শুরুতে এক বাঙালির কাছ থেকে তাঁর এহেন তিক্ত অভিজ্ঞতা হলেও বাঙালিদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, সম্মান বিন্দুমাত্র কমেনি। উদাহরণ পাওয়া যায় একটি ঘটনায়। তখন পাঁচের দশকের শুরু। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস অবলম্বনে 'ফিল্মিস্তান'-এর প্রযোজনায় তৈরি হবে চলচ্চিত্র। সংগীত পরিচালক হেমন্ত কুমার (মুখোপাধ্যায়) লতাকে দিয়ে বিখ্যাত 'বন্দে মাতরম' গানটি গাওয়াতে চান। কিন্তু সকলেই হেমন্তকে বললেন, 'ফিল্মিস্তান'-এর সঙ্গে যেহেতু শশধর মুখোপাধ্যায়ও যুক্ত রয়েছেন, তাই শিল্পী বোধহয় 'না' করে দেবেন! আশ্চর্য ব্যাপার, হেমন্ত তাঁর কাছে গিয়ে প্রস্তাব পাড়তেই রাজি হলেন লতা। জানালেন, হ্যাঁ, 'ফিল্মিস্তান'-এর সঙ্গে তাঁর ঝামেলা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু হেমন্তর সঙ্গে তো হয়নি! আর হেমন্তকে ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন তিনি। তাই তাঁর রাজি হওয়া। এর মধ্যে যেন টাকার কথা না আসে! এমনই ছিল হেমন্তর প্রতি তাঁর সম্মানবোধ।

'আমি চলতে-চলতে...'



'বসুশ্রী'-র অনুষ্ঠানে লতা মঙ্গেশকর, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্যরা

তাঁর প্রিয় হেমন্তদাদার সঙ্গে তো বটেই, কাজ করতে-করতে লতা পরে সলিল চৌধুরীর সঙ্গেও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে যান। দুই শিল্পীর সঙ্গেই সেই সম্পর্ক পরে পারিবারিক স্তরে পৌঁছে যায়। পরের দিকে সে সম্পর্ক এমনই পর্যায়ে পৌঁছয় যে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী বেলা মুখোপাধ্যায় যখন গর্ভবতী, তখন সাধ খাওয়াচ্ছেন তাঁকে। কলকাতায় এলে হেমন্তর ভবানীপুরের বাড়িতে থেকে যাচ্ছেন। সলিল চৌধুরীর কন্যা অন্তরা চৌধুরী জানাচ্ছেন, "লতাদিদি বিদেশ গেলেই সেখান থেকে বিঠোফেন, মোৎজার্টের বিভিন্ন সিম্ফনির নোটেশন, স্কোরশিট উপহার আনতেন বাবার জন্য। বাবাকে তিনি বলেছিলেন, 'দাদা, আপনাকে ছাড়া আর কাকেই বা আমি এগুলি দিতে পারি?" আর এক শিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তাঁর ছিল আত্মিক যোগ। সন্ধ্যার সঙ্গে এক বিছানায় বসে গল্প করছেন লতা, এ দৃশ্যও গেঁথে রয়েছে অনেকের স্মৃতিতে!



যুগলবন্দি: লতা মঙ্গেশকর-মান্না দে

লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে বেশ কিছু কাজ করেছিলেন শ্যামল মিত্রও। তাঁর পুত্র সৈকত মিত্র যেমন জানালেন, "শুনেছি, কলকাতায় এলেই শহরের বিখ্যাত বিপণি থেকে হিরে কিনে নিয়ে যেতেন তিনি। এছাড়া শাড়ি তো কিনতেনই। আশাদিদির কাছে শুনেছি, লতা মঙ্গেশকর নাকি কৌটো করে হিরে জমাতেন, কারণ তাঁর ধারণা ছিল, হিরে রাখলে তা সমৃদ্ধি বহন করে আনে।" বাঙালি খাবারদাবার, বিশেষ করে মিষ্টি খেতে ভালবাসতেন তিনি। মাঝে-মাঝে বাঙালি খাবার খাওয়ারও আবদার জানাতেন তিনি। তবে এতবার কলকাতায় এলেও কখনও দুর্গাপুজো দেখতে পারেননি, এই নিয়ে আফসোস ছিল তাঁর।

...এবং কলকাতা



হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মায়ের সঙ্গে

লতা মঙ্গেশকরের কথা বললে বলতেই হয় 'বসুশ্রী'র বিখ্যাত বৈশাখী অনুষ্ঠানের কথা। তখন পাঁচের দশকের কলকাতা। কোনও এক অনুষ্ঠানের জন্য লতা আর গীতা দত্ত শহরে এসেছেন। গ্র্যান্ড হোটেলে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হলেও হোটেলে না উঠে লতা সেবার উঠেছিলেন 'দাদা' হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। প্রিয় লতা এসেছে, অতএব 'ফাংশন' তো করতেই হয়। এই তাগিদে 'বসুশ্রী'-তে পয়লা বৈশাখে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর জন্য লতা কোনও সাম্মানিক নেননি। কারণ, হেমন্তদাদা বলেছেন, এটাই যে তাঁর কাছে শেষ কথা! বেলুড় মঠে বরাবর যেতে চাইতেন তিনি। শেষমেশ হেমন্তদাদার কল্যাণেই পূরণ হয় তাঁর সে আবদার। সেবার ভাল করে ঘুরে দেখেছিলেন বেলুড় মঠ। শোনা যায়, মঠের সন্ধ্যারতি দেখে কেঁদে ফেলেছিলেন তিনি।



বাংলা ভাষার পাশাপাশি বাঙালির সংস্কৃতির প্রতিও সমানভাবে কৌতূহলী ছিলেন লতা মঙ্গেশকর। তাই তো বাংলায় না হলেও অনুবাদে পড়ে ফেলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস। জানিয়েছিলেন, শরৎচন্দ্র তাঁর প্রিয় বাঙালি লেখক। শ্রীরামকৃষ্ণের মতাদর্শে বিশ্বাস করতেন তিনি। অসম্ভব শ্রদ্ধা ছিল স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিও। পছন্দ করতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানও। আর সে গানকে পাথেয় করেছিলেন বলেই বারবার চাইতেন রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে। তাই দেখা যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় যখন তাঁকে দিয়ে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়াচ্ছেন, তখন তিনি ভাল করে বুঝে নিচ্ছেন সে গানের ইতিহাস, অর্থ ও অনুষঙ্গ।



কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে, সঙ্গে রয়েছেন আশা ভোঁসলেও

লতা মঙ্গেশকরের কলকাতা-কানেকশন সম্পর্কে আর একটা কথাও শোনা যায়। তাঁর বিশেষ পছন্দের ছিল নাকি শহরের এক বিশেষ দোকানের তৈরি করা হারমোনিয়াম। তখন বাংলা গানের স্বর্ণযুগ। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বাংলার তাবড় শিল্পীর হারমোনিয়াম বানানো হত এক নির্দিষ্ট বাদ্য-যন্ত্র প্রস্তুতকারকের কাছ থেকেই। তিনিই তৈরি করেছিলেন ভারতের প্রথম ফোল্ডিং হারমোনিয়াম। সহজে ফোল্ড করে নেওয়া যায় বলে এরপর শিল্পীদের কাছে এই বিশেষ হারমোনিয়ামের কদর বাড়তে থাকে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় নাকি এই দোকান থেকেই তাঁর নিজের জন্য একটি হারমোনিয়াম কিনে নিয়ে লতা মঙ্গেশকরকে দেখান। তখন এরকম সহজে বহনযোগ্য ফোল্ডিং হারমোনিয়াম বম্বেতে পাওয়া যেত না। তা দেখে লতার এত ভাল লাগে যে সেখান থেকে অর্ডার দিয়েই পরে নিজের জন্য একটি হারমোনিয়াম বানিয়ে নিয়েছিলেন তিনি।

'প্রিয়তম...'



লতা মঙ্গেশকর আর আশা ভোঁসলে, দু'জনেই বাঙালির বড় বেশি প্রিয়। কিন্তু তাও বাঙালি কাকে এগিয়ে রাখবে? লতা-আশা দ্বন্দ্বের শাশ্বত এ বিতর্কে কার পক্ষ নেবে? উত্তর পাওয়া গেল সৈকত মিত্রের থেকে। তাঁর কথায়, "মোটামুটি সাতের দশক থেকেই আশা বাঙালির প্রিয় হয়ে উঠছিলেন। তখন আর. ডি. বর্মণের সঙ্গে অনেক কাজ করছেন আশা, মোটামুটি বাঙালির ঘরের মেয়ে হয়ে উঠেছেন। লতা কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই বাংলায় গাইছেন। সেই গানগুলো এত 'পিওর', তখনকার বাঙালি-মননে এমনভাবে গেঁথে রয়েছে যে তারপর 'এনে দে রেশমি চুড়ি'-র সুর আর তাদের মননে ঢুকল না। আসলে আর.ডি. আর আশার স্টাইল অনেক বেশি আরবানাইজ়ড। তবে পরবর্তী প্রজন্ম, যাঁদের কাছে গান শোনা মানে নিছক অনুভূতি নয়, 'জানি না, কোথায় তুমি'-র শিহরণ, উন্মাদনা, তাঁদের কাছে লতা না আশা, কে বেশি প্রিয়, তা তর্কসাপেক্ষ।"



সলিল চৌধুরীর সঙ্গে একাধিক কাজ করেছেন লতা

'চঞ্চল মন আনমনা', 'আষাঢ় শ্রাবণ মানে না তো মন', 'আমি চলতে চলতে থেমে গেছি', 'সাত ভাই চম্পা', 'পা মা গা রে সা', 'প্রিয়তম, কী লিখি তোমায়', 'কে প্রথম কাছে এসেছি', 'ওঠো, ওঠো সূর্যাই রে', 'মঙ্গলদীপ জ্বেলে', 'বলছি তোমার কানে কানে', 'নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থ পাখিরা', অজস্র জনপ্রিয় গান তাঁর কণ্ঠে। কাজ করেছেন অজস্র বাঙালি সংগীত পরিচালকের সঙ্গে। মহারাষ্ট্র আর পশ্চিমবঙ্গ, কয়েক হাজার কিলোমিটারের ব্যবধান হলেও গানের সুরে-সুরে মিলে এক মরাঠি কন্যার বাংলার আত্মীয় হওয়া কিন্তু আটকায়নি।

সৈকত মিত্র

(সংগীতশিল্পী, শ্যামল মিত্রের পুত্র)



বাবার সঙ্গে লতা মঙ্গেশকরের প্রথম কাজ সলিল চৌধুরীর সুরে, 'বিরাজ বহু' সিনেমায়। ডুয়েট, 'মেরা ঘর আবাদ রহে'। তখন লাইভ রেকর্ডিং হত। এই গানে বাবার অংশটা ছিল আপার অক্টেভে। তখন লতাদিদির বিস্তর নাম। বাবা বম্বেতে নতুন, কেউ চেনে না। সলিলদাকে বাবা গানটা হাফ নোট উঁচু করে দেওয়ার কথা বলেন। লতা তখন বলেছিলেন, 'অওর উপর জায়েঙ্গে আপ?' রিহার্সালের সময় বাবাকে লতা বলেছিলেন, 'আপনার গলায় সেতারের তারের মতো এমনভাবে সুরগুলো ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাচ্ছে কেমন করে?' লতা মঙ্গেশকর কমপ্লিমেন্ট দিয়েছেন, এটা নিয়ে বাবার গর্ব ছিল। বাবার ইচ্ছে ছিল যদি কোনওদিন আধুনিক গানে সুর করেন, লতা গাইবেন। কিন্তু সেটা আর হয়নি।

অন্তরা চৌধুরী

(সংগীতশিল্পী, সলিল চৌধুরীর কন্যা)



বাবা সবসময় বলতেন, লতা মা সরস্বতীর কণ্ঠ। জানতেন, লতার জন্য কঠিন গানগুলো রেখে দিলে ক্রিয়েশনের প্রতি জাস্টিস হবেই। বাবাই ওঁকে দিয়ে প্রথম মলয়ালম গান গাওয়ান, 'নেল্লু' ছবিতে। তখন আমি মুম্বইতে পড়াশোনা করি। 'আজ নয় গুনগুন'-এর রেকর্ডিংয়ের সময় স্টুডিয়োতে গিয়েছিলাম। বাবা যখন গান তোলাচ্ছেন, লতাদিদি খুব সফটলি গাইছিলেন। পরে যখন ভাল করে গান তুলে নিয়ে মাইকের সামনে গেলেন, তখন দরাজ গলায় গাইলেন, একটা 'টেক'-এই 'ওকে'। আসলে উনি আর্টিস্ট হিসেবে গলাটাকে প্রিজার্ভ করছিলেন। পুরোপুরি তৈরি হয়ে তবেই মাইকের সামনে আসতেন।

আমার সঙ্গে উনি বাংলাতেই কথা বলতেন। মার কাছে শুনেছি, বাঙালি খাবার খেতে ভালবাসতেন, কিন্তু ঝাল-ঝাল খেতেন। মায়ের মনে অভিমান ছিল যে, বাবা লতাদিদিকে সব রোম্যান্টিক গান দিয়ে দিতেন আর মাকে জ্ঞানের গান দিতেন। একবার বাবাকে পুজোর গান করতে হবে। কিছুতেই সুর আসছিল না। মাকে বললেন, 'চলো পওয়াই লেকে বেরিয়ে আসি। একটু পরেই বাবার সুর এসে গেল। বাড়ি এসে বাবা তবলায় বসলেন, মা হারমোনিয়ামে সুর তুলে নিলেন। তৈরি হল 'না যেও না'। পরে গানটা লতাদিদি গাইলেন। গানের ব্যাপারে বাবা নিশ্চিত থাকতেন যে, কোন গান কার গলায় লাগবে। আমার মেয়ে বা স্ত্রী বলে পার্শিয়ালিটি করতেন না।

রাণু মুখোপাধ্যায়

(সংগীতশিল্পী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কন্যা)



কলকাতায় এলে লতাজি হোটেলে না উঠে থাকতেন আমাদের বাড়িতে। ঠাকুমার সঙ্গে তাঁর ছিল ভারী বন্ধুত্ব, রাতে ঠাকুমার সঙ্গেই ঘুমোতেন। সকালে উঠে পুজো করতেন। এমনকী তাঁরা পরস্পরের শাড়িও এক্সচেঞ্জ করতেন। তিনতলায় বাথরুম ছিল না বলে লতাজি দোতলায় নেমে যেতেন। নিজের জামাকাপড় নিজেই কাচতেন তিনি। বাড়িতে রান্না হত, তিনি একতলার রান্নাঘরে ছোট পিঁড়িতে বসে গল্প করতেন সকলের সঙ্গে। তবে বেশিরভাগ সময়ে নিজের রান্না নিজে করতেন। একবার সকলের জন্য রান্না করেছিলেন! বাঙালি খাবার খেতে ভালবাসলেও লতাজির জন্য বিশেষ মরাঠি রান্নার ব্যবস্থা করা হত। আমার তখন তিন বছর বয়স, শাড়ি পরানো হয়েছিল। লতাজি এসে আমার বেশ কিছু সুন্দর ছবি তুলে দিয়েছিলেন। সেগুলো আমার সারাজীবনের সম্পদ।

ছবি: আনন্দবাজার আর্কাইভ ও ইন্টারনেট

রহে না রহে হম...

পায়েল সেনগুপ্ত



লতা মঙ্গেশকরের *জীবন এক বিস্ময়কর উড়ান। জীবন্ত সরস্বতী তাঁকে বলা হলেও সেই জীবনে রয়েছে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত, যার সবটাই 'দেবী' সুলভ নয়। কিন্তু তাও কেন তিনি অনুপ্রেরণা? লিখেছেন পায়েল সেনগুপ্ত।*

জীবন যখন, তখন তো তার প্রবহমানতা থাকবেই। আবার যা বহমান, তা আপাতদৃষ্টিতে সরলরৈখিক মনে হলেও এমন হতেই পারে, তার গভীরে অনেক রক্তক্ষরণ রয়েছে। বিশেষ করে একটি মেয়েকে যদি একেবারেই কিশোরী বয়সে তার বাবাকে হারিয়ে পুরো সংসারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হয়, তাও আবার বিশেষ করে এমন একটি পেশায়, যার আধার 'সংগীত' (পড়শোনা করে চাকরি পাওয়া হলেও ব্যাপারটা একরকম ছিল) এবং এমন একটি সময় ও সমাজে যেখানে পুরুষদেরই আধিপত্য, সেক্ষেত্রে সেই বিশেষ মেয়েটির যুদ্ধের কাঠিন্য অনুমান করা কঠিন নয়। চল্লিশের যুগে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি মেয়ের সংগীতকেই জীবনের সম্বল করে প্লে-ব্যাকের দিকে পা বাড়ানো, সে যতই তাঁর সহায়তা করার জন্য অগ্রজপ্রতিম মানুষরা থাকুক না কেন, সহজ নয় একেবারেই। অনেক প্রত্যাখ্যান সহ্য করে, অনেক পছন্দ-অপছন্দের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে যে অপ্রতিরোধ্য 'লতা' তৈরি হলেন, তাঁর পিছনে শুধুই ট্যালেন্টই শেষ কথা, বলে লেখা শেষ করে দিলে ঠিক হবে না। প্রতিভাকে সঠিকপথে এবং সঠিকভাবে চালনা করা জরুরি। এই 'সঠিক'-এর মাপকাঠি যে সবসময় সমাজ নির্ধারিত কোনও সংজ্ঞার সঙ্গে মিলবে, তা নয়। কিন্তু কোথাও একটা সততা থাকতে হবে, নিজের প্রতি এবং

লক্ষ্যের প্রতি। এই সত্য এক দীর্ঘ নয় দশক ব্যাপী জীবনে লতা মঙ্গেশকর এত সুন্দর ও স্বচ্ছভাবে বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন যে তাঁকে উত্তর থেকে দক্ষিণ গোটা দেশেরই 'আইডল' মানতে কোনও বাধার সৃষ্টি হয়নি।

ইয়ে জ়িন্দগি উসিকী হ্যায়

'বিস্ময়কর' উত্থান বলে যতই লতা মঙ্গেশকরের জার্নিকে ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, এই 'বিস্ময়' যে শুধুই তার একার যাপন এবং প্রতিভায়, এমনটা একেবারেই নয়। বরং লতা মঙ্গেশকরকে ভাগ্যবতী বলতেই হবে, তিনি অনেকগুলি বিস্ময়ের সমন্বয়কে পেয়েছেন নিজের পাশে, তাঁর সাপোর্ট সিস্টেম হিসেবে। লতার গানের কথা লিখেছেন সাহির লুধিয়ানভি, শাকিল বদায়ুনি, শৈলেন্দ্র, মজরুহ সুলতানপুরি, রাজা মেহেদি আলি খান, রাজেন্দ্র কৃষ্ণ, যোগেশ এবং আরও পরবর্তী কালে গুলজ়ার, ইন্দিবর, আনন্দ বকসি এবং একেবারে হাল আমলের প্রসূন জোশি। এঁরা প্রত্যেকেই লতার কেরিয়ারে এক-একটি মাইল ফলক খোদাই করেছেন। সুরকার হিসেবে লতা পাশে পেয়েছিলেন অনিল বিশ্বাস, সি রামচন্দ্র, নৌশাদ, রোশন, শঙ্কর-জয়কিষণ, শচীন দেব বর্মণ, জয়দেব, পরবর্তীকালে আর ডি বর্মণ, রাজেশ রোশন, বাপি লাহিড়ী এমনকী এই প্রজন্মের এ আর রহমান বা যতীন-ললিতকে। লতার কেরিয়ারে উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল কম্পোজ়ার কে দত্ত, খেমচন্দ প্রকাশ, বসন্ত দেসাই, পণ্ডিত গোবিন্দরামের। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং সলিল চৌধুরী তো তাঁর জীবনেরই অবিচ্ছদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিলেন। আসলে সাপোর্ট সিস্টেম পেলেও সকলে ব্যবহার করতে পারেন না। লতা মঙ্গেশকরের বড় গুণ যে তিনি অপরের ভরসা ও নির্ভরতার মর্যাদা রাখতে পেরেছিলেন। কেরিয়ারের শুরুর দিকে তিনি ছিলেন বিনম্র, পর্যবেক্ষক, আশীর্বাদ ধন্যা, সকলের বন্ধু...শামশাদ বেগম, গীতা দত্ত কোথাও গিয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও এঁদের সঙ্গে কখনও সখ্যে ঘাটতি পড়েনি। নূর জাহানকে তিনি আইডল মনে করতেন। যেখানে নায়িকারা নিজেই গান গেয়ে লিপ দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ, সেখানে তাঁর প্রয়োজনীয়তা কোথায়, এটা তাঁকে খুব অল্প বয়সে বুঝতে হয়েছে। কণ্ঠস্বর থেকে ঝেড়ে ফেলতে হয়েছে ন্যাজ়াল টোন, আনতে হয়েছে ঝকঝকে স্মার্টনেস। 'আয়েগা আনেওয়ালা' বা 'হাওয়া মে উড়তা জায়ে'-র ফ্রেশনেস কিন্তু ১৯৪৫-এর রেকর্ডিংয়ে ছিল না। 'শাদি সে পহেলে' যে গানটি মহম্মদ রফির সঙ্গে তিনি প্রথম রেকর্ড করেছিলেন, সেই গান শুনলে বোঝা আশ্চর্য নয়, যে একদিন 'দো ঘুঁট মুঝে ভি' বা হাঁটুর বয়সি নায়িকার লিপে 'ঝুট বোলে কউয়া কাটে' বা 'জ়রা সা ঝুম লু ম্যায়ঁ' গাওয়া মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। আসলে ইয়ে জ়িন্দগি উসিকী হ্যায়, যিনি জিততে জানেন। জিততে 'জানলে' তবেই জিততে 'পারা' যায়।



ভীমসেন জোশী ও লতা



আলি আকবর ও রবি শঙ্করের সঙ্গে

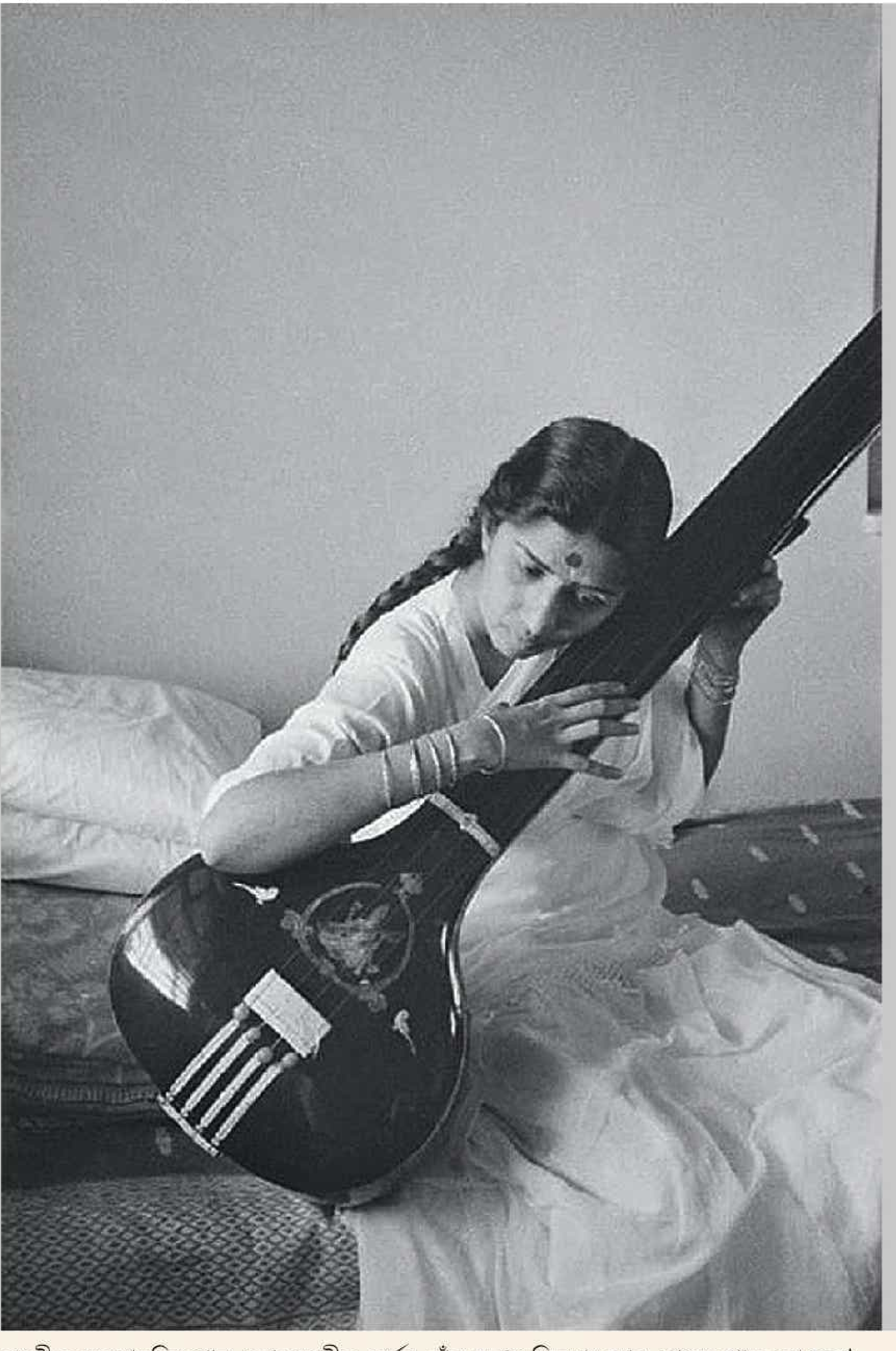
আরও কিছু দিতে বাকি ...

'অনুরাধা' ছবিতে তিলক শ্যামে লতা গাইছেন ক্যায়সে কাটে দিন ক্যায়সে কাটে রাতিয়া, বা জানে ক্যায়সে সপনো মেঁ খো গয়ি আখিয়াঁ। সুরকার পণ্ডিক রবি শঙ্কর। আবার 'আন্ধিয়া' ছবিতেও উস্তাদ আলি আকবর খাঁ-গাওয়ালেন লতা মঙ্গেশকরকে দিয়েই। মহারাষ্ট্র বা ভূ-ভারতে তো শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পীর অভাব ছিল না। তবুও এই আদ্যন্ত শাস্ত্রীয় সংগীতের ব্যক্তিত্বরাও কেন লতাকেই বেছে নিলেন তাঁদের প্লে-ব্যাকের জন্য? এমনকী, ভীমসেন জোশী বা ডি ভি পালুস্কর, আবদুল করিম খাঁ-র মতো শিল্পীরাও মহম্মদ রফি, মান্না দে-র পাশাপাশি প্লে ব্যাকে সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে একচেটিয়া লতা কেন? আসলে লতা নিজেকে সেভাবেই প্রস্তুত করেছিলেন। মস্তিষ্ক দিয়ে গান গাইতেন লতা, ফলে যে কোনও জঁরেই তিনি ফিট করে যেতে পারতেন। যে কোনও সহ গায়কের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্ব, মেজাজ ও টোন বুঝে নিজেকে তৈরি করে নিতেন। সবটাই করতেন খুব শান্তভাবে, নিজের মধ্যে, ভিতরে-ভিতরে, ফলে সব কিছুর পরেও তাঁকে ঘিরে একটা রহস্য রয়ে যেত যে, কীভাবে তিনি করতে পারলেন। অজস্র গান গেয়েছেন জীবনে লতা মঙ্গেশকর, খুব ভাল করেই তিনি জানতেন, তার অর্ধেকেরও বেশি গানের জন্য মানুষ লতা মঙ্গেশকরকে বা তাঁর গানকে মনে রাখবে না। কিন্তু যার জন্য মনে রাখবে, তাকে 'আইডেন্টিফাই' করতে হবে। এই আইডেন্টিফাই করার ক্ষমতাই তাঁর জীবন থেকে শিক্ষণীয়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, মদনমোহন বা নৌশাদ...লতার জীবনের সেরা কম্পোজিশন উপহার দিয়েছেন, এমনকী প্রথম দুজন বাংলাভাষাতেও। বাংলায় ওই গান যে গাইবার মতো আর কেউ ছিলেন না, তা তো নয়। কিন্তু ও গান তাঁকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে, লতা জানতেন, ফলে কোনও সুযোগই তিনি হাতছাড়া করেননি। লতার জানা ছিল কোথায় অবনত হতে হবে, কোথায় তরবারি চালাতে হবে। জীবনে 'অর্থ' এবং 'অরা'-ই শেষ কথা নয়, তাই বহু ক্ষেত্রে এই দুটোকে স্যাক্রিফাইস করেছেন তিনি। সকলে একবাক্যে তাঁকে বলতে পারেন 'ডাউন টু আর্থ', উস্তাদ বিসমিল্লাহ খান-এর খুব প্রিয় 'বেটি'। বহু শিল্পীর সঙ্গেই তিনি নাকি 'পলিটিক্স' করেছেন, তাঁদের গাইবার সুযোগ পেতে দেননি। কিন্তু প্রকাশ্য দিবালোকে কেউই সেকথা সোচ্চারে ঘোষণা করতে পারেননি। প্রেমের সম্পর্কও আদতে একটা 'কানাঘুযো'-র বেশি কিছু নয়। এই সবটাই তাঁর ব্যক্তিত্বের আড়াল। 'বাণিজ্যিক' বলে তাঁকে বিরূপ সমালোচনার মুখোমুখি হতে হবে জেনেও তিনি এই তকমা মোছার কোনও চেষ্টা করেননি কারণ তিনি জানতেন এই বিপুল 'পরিমাণ' বাণিজ্যিকতাই তাঁর শিরীযের পালক। এই 'বিপুল'-এর সংখ্যা সত্যিই অনেকখানি হয়ে গেলে তাকে আর অগ্রাহ্য করা যায় না, কোয়ালিটির নিরিখে বিচারও করা যায় না। লতা বয়সকালেও যতদিন সমর্থ ছিলেন, রেকর্ড করেছেন গান, কারণ তিনি জানতেন মানুষ তাঁকে এখন মনে রাখবে তাঁর কণ্ঠ কাদের আইডেন্টিটি তৈরি করেছে সেই হিসেবে। নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়ার এক অদ্ভুত তাগিদ ছিল তাঁর। এই তাগিদের সঙ্গে ব্যক্তিত্ব মিশিয়ে কীভাবে চলতে হয়, এই দীর্ঘ জীবনে সেটাই শিখিয়ে গেলেন তিনি।

তিনি লতা মঙ্গেশকর। সাদা রং যেমন অনেক রংয়ের সমন্বয়, তেমনই 'জীবন্ত সরস্বতী' তকমার আড়ালে সাদা শাড়ি পরিহিতাও একাধারে বহু বর্ণময় ব্যক্তিত্বের সমহার। ডিসিপ্লিন, ডেডিকেশন ও ডমিনেশন এই থ্রিডি ব্যক্তিত্ব নিয়ে তাঁর আত্মবিশ্বাসী উচ্চারণ, 'রহে না রহে হম..মহেকা করেঙ্গে, বনকে কলি, বনকে সবা, বাগে ওয়াফাঁ মেঁ...

আমার নয়ন দুটি শুধুই তোমারে চাহে...

পায়েল সেনগুপ্ত, অচ্যুত দাস, সংবেত্তা চক্রবর্তী



*শাস্ত্রীয় সংগীত, সমসাময়িক গান, লোকসংগীত, সর্বত্র তাঁর অবাধ বিচরণ। আর প্রেমের গান তো **লতা মঙ্গেশকরের** কণ্ঠের মাধুর্যেই হয়ে উঠত আরও প্রেমময়! লতার গান নিয়ে স্মৃতিতে ডুব দিলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুবোধ সরকার, সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্মরণজিৎ চক্রবর্তী।*



লতা মঙ্গেশকরের কথা বলতে বসে মনে পড়ছে গীতা দত্তর কথাও। গীতা দত্ত লতার চেয়ে অনেক কম গেয়েছেন। কিন্তু যে ক'টা গেয়েছেন, সবগুলোই ভীষণ ভাল গান। ওঁর গলায় একটা অদ্ভুত মাদকতা ছিল। অসাধারণ শিল্পী, অসাধারণ কণ্ঠ। এ ছাড়া শামশাদ বেগম ছিলেন। আর আশা ভোঁসলেরও পরের দিকে কিছুটা উত্থান হয়েছিল। এঁদের মধ্যে লতা এগিয়ে থাকবেন তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠের জন্য, যা তিনি জন্মের সময়ই সঙ্গে

নিয়ে এসেছিলেন। লতার প্রথম যে হিন্দি গান শুনি সেটা ছিল 'আয়েগা আয়েগা'। অসম্ভব সুন্দর একটা প্রেমের গান। গানটা লিখেছেন কেউ এক জন, সুর দিয়েছেন আর কেউ। ওতে লতার অবদান শুধু তাঁর গায়কি আর কণ্ঠ। তাতেই বাজিমাত। প্রেমের গানই তিনি বেশি গেয়েছেন। যেমন 'লগ যা গলে', 'না জানে কিঁউ হোতা হ্যায়', 'তেরে বিনা জিন্দেগি সে কোই', 'এক পেয়ার কা নাগমা হ্যায়', 'নয়না বরসে রিমঝিম'... ওঁর গাওয়া বাংলা গানও কিছু কম নেই। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সখ্য ছিল। ওঁর সুরে, সলিল চৌধুরীর সুরে, আরও অনেকের সুরেই গান গেয়েছেন। 'কেন কিছু কথা বলো না', 'ও বাঁশি হায় বাঁশি কেন গায়', 'না যেয়ো না রজনী এখনও বাকি', 'ওগো আর কিছু তো নাই', 'আকাশপ্রদীপ জ্বলে', 'প্রেম এক বারই এসেছিল নীরবে', 'আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব', 'যারে যারে উড়ে যারে পাখি'... বাংলায় ওঁর অজস্র গান আছে। অন্যান্য ভাষাতেও তিনি গেয়েছেন।



সলিল চৌধুরী তাঁর সমসাময়িক সুরকারদের চেয়ে অন্য রকম ছিলেন। স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলতেন না তিনি কখনওই। লতাও বলতেন, সলিল চৌধুরী অদ্ভুত সুর বানান বলেই অন্য অনেক শিল্পীর মতো তিনিও সলিল চৌধুরীর সঙ্গে কাজ করার জন্য মুখিয়ে থাকতেন। যেটা সবচেয়ে ভাল লাগে, লতা এবং আশা, দু'জনেরই বাংলা উচ্চারণে কোনও জড়তা নেই। রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্পিরিটটা লতা বুঝতেন। অনেক রবীন্দ্রসঙ্গীতই খুব নিপুণ ভাবে উনি গেয়েছেন।

সবচেয়ে দামি যে জিনিসটা তাঁর কাছে ছিল তা হল তাঁর কণ্ঠসম্পদ। সঙ্গে তাঁর গায়কি। গীতা দত্তর গানও আমার খুব ভাল লাগত। সত্যি বলতে, ওঁর কিছু গান আমার লতার গানের চেয়েও বেশি পছন্দের। তবে গীতা দত্ত হতাশ হয়েই হয়তো, খুব বেশি দিন গান গাননি। শামশাদ বেগমের গানও আমার খুব ভাল লাগত। ওঁর গলায় একটু কারুকাজ ছিল। কিছুটা নাকি সুরে গান গাইতেন। লতার গলাই ছিল প্রেমের গানের গলা। তাই প্রেমের গানই বেশি গেয়েছেন। দেশপ্রেমের গানও ছিল তার মধ্যে। 'একবার বিদায় দে মা', 'বন্দেমাতরম', 'অ্যায় মেরেঁ ওয়তন কে লোগোঁ'... এই গানগুলোও তিনি কী সুন্দর গেয়েছেন!

গান তো তিনি অনেক দিনই হল আর গাইতেন না। বয়সের জন্য তাঁর সেই জাদুকণ্ঠ আর ছিল না। কিন্তু মানুষটা বেঁচে ছিলেন। এই বেঁচে থাকাটাই অনেক কিছু। একটা মানুষ আছে আর একটা মানুষ আর নেই, এই দুটোর মধ্যে

অনেক তফাত হয়ে যায়। আমাদের একটা স্বস্তি ছিল, লতাজি শারীরিক ভাবে বেঁচে আছেন। আমার ধারণা অতিমারি তাঁকে কাবু না করলে আরও কিছু বছর উনি বেঁচে থাকতেন। কারণ উনি খুবই সংযত জীবন কাটিয়েছেন।

কখনও উনি কারও সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন কিনা, তা নিয়ে অনেক গুজব আছে। সেসবের সত্যাসত্য তো আমরা সাধারণ মানুষরা জানি না। তবে এটা জানি যে উনি খুব আস্তিক ছিলেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল। পুজোপাঠ করতেন। আধ্যাত্মিকতার অভ্যেস ছিল। খুব মাদারলি এক জন ছিলেন। সকলের জন্যই মা-মা একটা ব্যাপার ছিল ওঁর মধ্যে। ওদিকে আবার প্রেমের গানও গাইছেন। দুটোকে মেলানো একটু শক্ত, তাও মিলিয়েছেন। অনেক বয়সেও প্রেমের গান গেয়েছেন।

ওঁর জীবনে পরিণত প্রেম আমরা দেখতে পাইনি, কিন্তু প্রেমের গানে নিজের প্রাণ ঢেলে গেয়েছেন। কে জানে, সেই প্রেম হয়তো ঈশ্বরপ্রেম থেকেও এসে থাকতে পারে।

সুবোধ সরকার



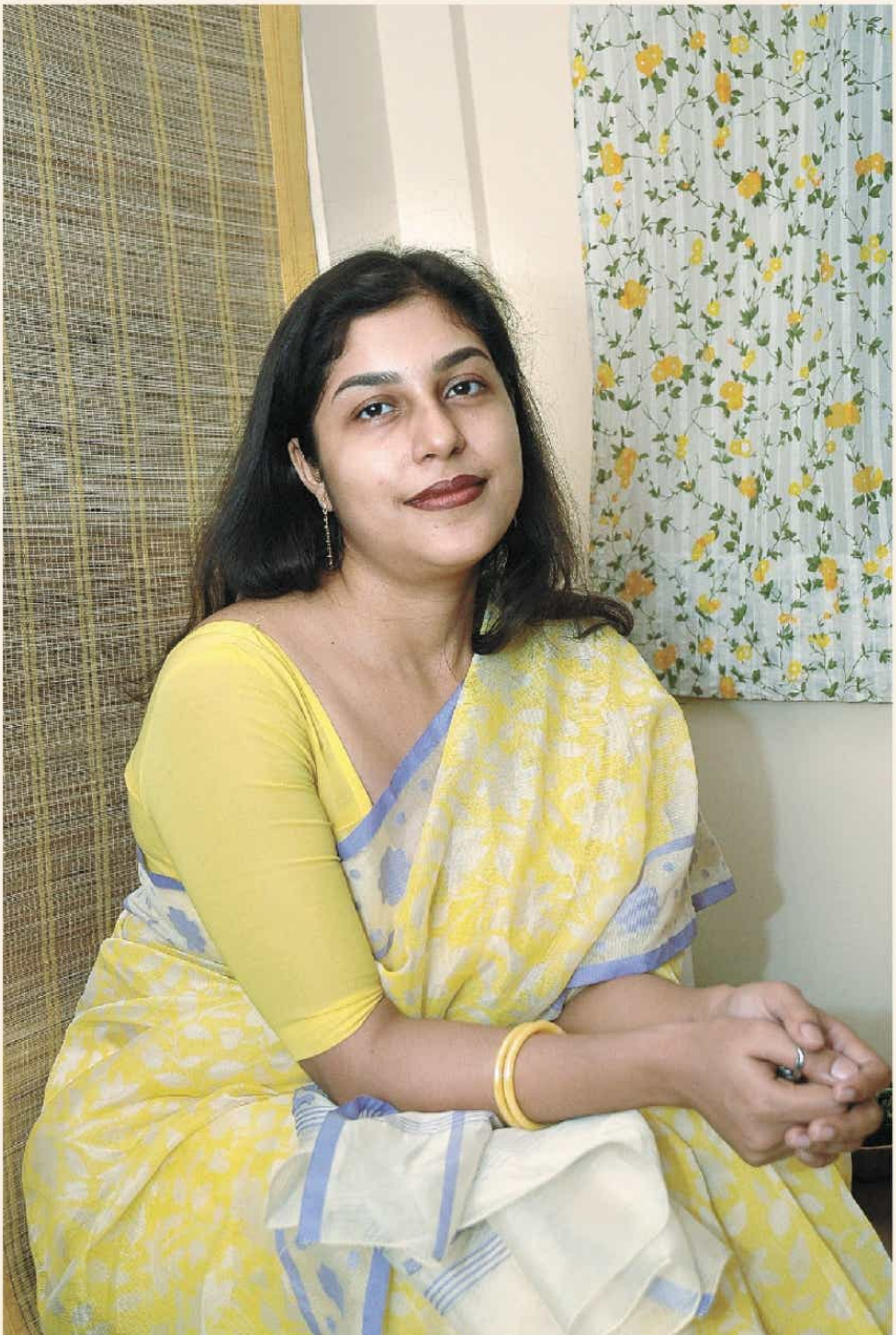
লতা মঙ্গেশকরের গলায় এমন একটা সুর ছিল যেটা ভূভারতে আর কারও গলায় ছিল না। ওই সুরে এমন একটা প্রেম ছিল, যে প্রেম আর কারও গলায় ছিল না। ওই প্রেমে এমন একটা ফাল্গুন ছিল, যে আর কারও গলায় অমন ফাল্গুন ছিল না। তিনি গান গাইতেন আর আমার মনে হত আকাশ গান গাইছে। তিনি গান গাইতেন আর আমার মনে হত প্রতিধ্বনির কান্না বৃষ্টি হয়ে নামছে। তিনি গান গাইতেন আর আমার মনে হত মর্মরের কোরাস। গায়কের গলায় যেমন শরাবি থাকে, গায়িকার গলায় তেমনি থাকে শ্রাবণ। আষাঢ় শ্রাবণ মানে না তো মন। সেই আষাঢ়, সেই শ্রাবণ।

লতা মঙ্গেশকর গান গাইতেন না, গান নিজে গাইত লতা মঙ্গেশকরকে। বীণা নিজে থেকে বাজে না। তাকে একজন বাজায়। কে বাজাত তাঁর বীণা? তাঁর বীণা বাজাতেন দেবী সরস্বতী। আর তাঁর তানপুরা বাজাত হাওয়া। সা আর পা ধরে হাওয়া পৌঁছে যেত তাঁর গানের ঘরে। এ হাওয়া সেই হাওয়া যা পাতায় পাতায় লেগে 'মর্মরিয়া বনকে কাঁদায়'। সেই হাওয়া বসন্তের। সেই হাওয়া না থাকলে প্রেমের হাহাকার ও লেলিহান আনন্দ একসঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারে না এক গলা থেকে। ভালবাসার আর এক নাম কষ্ট। সেই কষ্টকে তিনি বালি আর আগুন

দিয়ে মুছে গলায় তুলতেন। নিজের ভিতরে কষ্ট ছিল তাই তিনি কষ্টকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুরে বসিয়ে গাইতেন। সুন্দরের সবটা চোখে দেখা যায় না। সুন্দর নিজের একটা অর্ধেক মানুষের জন্য রেখে বাকি অর্ধেক লুকিয়ে রাখে নিজের জন্য। কিন্তু সে হেরে গিয়েছিল লতা মঙ্গেশকরের কাছে। লুকোনো অর্ধেক উঠে এসেছিল তাঁর গলায় ।

তাঁর গলা হয়ে উঠেছিল ভারতবর্ষ । তাঁর সুর হয়ে উঠেছিল ভারতের ধানখেত। একটা ধ্বনি পাহাড় থেকে নেমে গঙ্গার ওপর দিয়ে যেতে- যেতে অরণ্যের ভেতর দিয়ে যেত- যেতে জনপদের বিষন্নতাকে সঙ্গে নিয়ে যেদিন উপকূলে আছড়ে পড়ে সেদিন যেভাবে প্রতিধ্বনি হয়ে ওঠে, সেভাবেই একটা সুর কোমল গান্ধার হয়ে ওঠে তাঁর গলায়। এত প্রেমের গান তিনি গেয়েছেন, বাঙালিকে বুঁদ করে রেখেছেন, বাঙালিও তাঁকে হিরের নাকছাবি পরিয়ে দিয়েছে। এই নাকছাবি কোনওদিন কেউ খুলতে গেলে তার হাত খসে পড়বে। লতা মঙ্গেশকর বাঙালির সরস্বতী। বাঙালি কি সরস্বতী ছাড়া বাঁচতে পারে?

সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়



আমার বিয়ে হল ১৯৯৫-এর মে মাসে। আর 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে' রিলিজ় হল ১৯৯৫'এর অক্টোবর মাসে। যদি আমার বিয়ে হওয়ার দশ দিন আগেও ডিডিএলজে দেখে ফেলতাম- এ বিয়ে আমি কখনও করতাম না। বিয়ে হয়ে গিয়েছে, ডিডিএলজে দেখে বুকটা পুড়ে গেল! ছবিটা দেখতে দেখতে প্রতি মুহূর্তে যন্ত্রণা হল। যন্ত্রণা হল নানা কারণে। সেই টানাপোড়েন আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। এক তো শাহরুখের জন্য যে রকম একটা পাগলের মতো প্রেম টের পাচ্ছিলাম, সেটা নিজের মনের কাছেই আমাকে অপরাধী করে তুলেছিল। আর একটা জিনিস হচ্ছিল। মন খারাপ। পিছিয়ে পড়ার জন্য মন খারাপ। বিয়ে হয়ে গিয়েছে। আর তো অবলীলায় প্রেম করতে পারব না, আমি তো আর প্রেম করার জন্য উপযুক্ত নই। আর তারপরেই প্রচণ্ড আফসোস হচ্ছিল গান গুলো শুনে। 'মেরে খোয়াবো মেঁ জো আয়ে/ আ কে মুঝে ছেড় জায়ে/ উসে কহো কভি সামনে তো আয়ে'। এই গান লতা মঙ্গেশকরের গলায় শুনছি। তখন আমার বয়স কুড়ি। ডিডিএলজে, সতেজ একদল ছেলেমেয়ের যৌবনের আনন্দময় উদযাপন, প্রেম, ভ্রমণ, ওই লোকেশন, আর গান। সে যে কী ভয়ঙ্কর হাতছানি! একটা স্বপ্নের মধ্যে স্বেচ্ছায় ঢুকে অন্য একটা স্বপ্নে পা দেওয়ার চেষ্টার চেয়ে কষ্টকর আর কিছু হতে পারে না। যেন একটা ঝড়ের গতিতে চলতে থাকা ট্রেনের কম্পার্টমেন্টের দরজায় দাঁড়িয়ে ঝড়ের গতিতে উল্টো দিকে ছুটে যাওয়া, আর একটা ট্রেনের কোনও একটা কামরায় লাফ দিয়ে উঠে পড়ার চেষ্টা করা! লতাজির গান যেন সেই বিপদসঙ্কুল পথে পা বাড়ানোর সবচেয়ে বড় ইন্ধন। এই ঘোর আমার কাটতেই চায়নি কোনদিন। অবশ্য এটা আমার স্বভাবেই ছিল বেসিকালি। প্রেমের গান, ঈশ্বরের জন্য নিবেদন করা গান- এই দুই ধরনের গানই আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যেতে চায় এবং সে ব্যাপারে লতা মঙ্গেশকরের গান অসংখ্যবার ঘর থেকে পথে টেনে নিয়ে চলে যেতে চেয়েছে। এতটাই কথা আর সুরকে নিজের গলায় মন্থন করতে পারতেন লতাজি। আর তেমনই গলার কোয়ালিটি। সেদিনই বলছিলাম, কেন লতাজির মতো কেউ নেই, কেউ হবে না। তার কারণ ওঁর টোনাল কোয়ালিটির মধ্যে ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের মাটি থেকে উঠে আসা সুর আর বোধ। ব্যস। এছাড়া কোন কাস্ট, ক্রিড, ক্লাস স্টেট, রিজিয়ন, ল্যাংগুয়েজ, শহর, গ্রাম, উচ্চারণ, যুগ-যুগান্তর... কিচ্ছু পাওয়া যেত না ওঁর গলায়। এ যে কত বড় একটা আশীর্বাদ ভাবা যায় না। শুধু স্বচ্ছ সুর ছাড়া আর কিছু উনি গলায় পোষেননি। ফলে উনি 'প্রিয়তম তুমি ছাড়া ভাল লাগে না আমার/ কী লিখি তোমায়' গান বা 'হাওয়া মেঁ উড়তা জায়ে/ মেরা লাল দুপট্টা মলমল কা' গান কিংবা "তু জাঁহা জাঁহা চলেগা/ মেরা সায়া' অথবা 'দর্দ সে মেরা দামন ভর দে ইয়া আল্লাহ' গান- যা-ই গান না কেন, গানে অচেনা অপ্রয়োজনীয় আগন্তুককে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়নি।

ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছিলেন লতা। আমাদের অসীম সৌভাগ্য, ওঁর গানগুলো জন্ম থেকে শুনেছি। পৃথিবীর কখনও ওঁর মেলোডি শূন্য হবে না, এটাই আসল কথা। কোথাও না কোথাও লতাজি বাজতে থাকবেন যতদিন মানুষ থাকবে। আমিও আমার প্লে লিস্টে লতা মঙ্গেশকরকে ভর্তি করে রেখেছি। বাজাতে বাজাতে চলে যাব। ওঁর প্রেমের গানগুলোর মধ্যে 'ও মোর ময়না গো', 'ভোর ভয়ে পনঘটপে', 'এক প্রেম দিওয়ানি/এক দরস দিওয়ানি', 'তুম চলে আও'- এরকম হাজারখানেক গান আছে, যা লিখতে গেলে রাতের পর রাত কেটে যাবে।

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী



লতা মঙ্গেশকরের গান আমি যখন প্রথম শুনি, তখন আমার বয়স পাঁচ-ছয়। দিনটা আমার এইজন্য মনে আছে কারণ তার পরের দিন আমাদের মফসসলের পাড়ায় একটা ফাংশন ছিল, আর তাতে আমায় জীবনে প্রথমবার কবিতা আবৃত্তি করতে হয়েছিল।

আমার মনে আছে, আমাদের বাড়িওলা জেঠুর মেয়ে সোমাদি হারমোনিয়াম নিয়ে বসে সেই ফাংশনেই গান গাইবার প্র্যাকটিস করছিল। সোমাদি হারমোনিয়াম নিয়ে বসে থাকলেও নিজে কিন্তু গাইছিল না। টেপ রেকর্ডারে ক্যাসেট ভরে চালিয়ে শুনছিল একটা গান! 'না যেও না, রজনী এখনও বাকি / আরও কিছু দিতে বাকি/ বলে রাত জাগা পাখি'। আমি সোমাদিদের দোতলার বারান্দাতেই হুটোপাটি করে খেলছিলাম, কিন্তু এই গানটা শুরু হতেই কেন কে জানে আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম! কার গলা এটা! কে গাইছেন এমন করে! যে গাইছেন তাঁর গলার সুরে কী আছে? কেন এমন মোহবন্ধনে পড়ে আমি দাঁড়িয়ে পড়েছি!

সেই বয়সে না বুঝেই, শুধুমাত্র অনুভব আর নিখাদ ভাললাগা আমায় স্তম্ভিত করে দিয়েছিল! এই গানের গূঢ় অর্থ সেই বয়সে আমার বোঝার কথা নয়, বুঝিওনি। কিন্তু ওই গলার স্বর! ওই সুর! তার মধ্যেকার কুহক আমায় যেন পেড়ে ফেলেছিল! আমায় যেন নিজের অনুগত বানিয়ে ফেলেছিল সারাজীবনের জন্যে!

পরে সোমাদির থেকে জেনেছিলাম যে গাইছেন তাঁর নাম লতা মঙ্গেশকর! তিনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়িকা! এখন কার কাছে কে শ্রেষ্ঠ সেটা সব সময় তর্কযোগ্য বিষয়, কিন্তু তাও এটা অনায়াসে বলে দেওয়া যায় যে আমাদের দেশ তথা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা অগণিত অনুরাগীর কাছে লতা মঙ্গেশকরই হলেন সুরের সম্রাজ্ঞী!

হেমা মঙ্গেশকর হিসেবে জীবন শুরু করেও পরে নাম পালটে নেন তিনি। অনেক ছোট বয়স থেকে পারিবারিক প্রয়োজনে কাজ করতে শুরু করেছিলেন। এমনকী বেশ কিছু সিনেমাতে অভিনয়ও করেছিলেন প্রথম জীবনে। এসব খবর আজ সকলের জানা! সকলের জানা তাঁর অসংখ্য গানের কথা! সিনেমার গানের জগতে তাঁর বিপুল অবদানের কথা! তাবড় তাবড় সংগীত বিশারদ তাঁকে বারবার কুর্নিশ জানিয়েছেন। প্রচুর খ্যাতি, দেশবিদেশের সম্মান- কী না পেয়েছেন! তাও বরাবর মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষ তিনি! নম্র ভাবে, বিনীতভাবে সকলকে সম্মান জানানোর মতো মহৎ মনের অধিকারিনী তিনি! আর সারাজীবন নিজের কাজের প্রতি সমানভাবে একনিষ্ঠ একজন শিল্পী!

এমন শিল্পী পাওয়া খুব কঠিন, যিনি প্রতিটা দশককে সমানভাবে ও সমাদরের সঙ্গে কাজ করে গিয়েছেন! লতা মঙ্গেশকর সেই বিরলতম শিল্পীদের অন্যতম। সেই চল্লিশ থেকে তাঁর জয়যাত্রার সূচনা হয়েছিল। তারপর প্রতিটা

দশকে তাঁর সুরের ডালি যেন নিত্যনতুন গানে ভরে উঠেছে! তাঁর গাওয়া- 'হাওয়া মেঁ উড়তা যায়ে মোরা লাল দুপট্টা মলমল কা', 'আয়েগা আনেওয়ালা' সহ নানা গান লোকের মনে আজও উজ্জ্বল! যেমন উজ্জ্বল পরবর্তী দশকে গাওয়া, 'শাম ঢলে খিড়কি তলে', 'ইয়ে রাত ইয়ে চান্দ', 'ইয়াদ কিয়া দিল নে', 'ধীরে ধীরে চল চান্দ গগন মেঁ' ইত্যাদি! ছয়ের দশকে তিনি মদনমোহনজির সুরে গাইলেন, 'লগ জা গলে কি ফির ইয়ে হসিন রাত হো না হো / শায়েদ ফির ইস জনম মে মুলাকাত হো না হো!' শচীন দেব বর্মণের সুরে গাইলেন 'গাইড' ছবির সব অবিস্মরণীয় গান! 'পিয়া তোসে নয়না লাগে রে', 'আজ ফির জিনে কি তমন্না হ্যায়', 'গাতা রহে মেরা দিল'-সহ আরও নানা অভূতপূর্ব গান! এই দশকেই 'সাওন কা মহিনা', 'জিন্দেগি ভর না ভুলেঙ্গে', 'তুঝে জীবন কি ডোর সে'-র মতো অসাধারণ গান!

সাতের দশক গান বদলের দশক। কিন্তু লতা মঙ্গেশকরের বদল হল না। এই দশকেও তিনি মাতিয়ে রাখলেন আসমুদ্রহিমাচল দেশবাসীকে। 'তুম আ গয়ে হো', 'তেরে বিনা জিয়া জায়ে না', 'তেরি বিন্দিয়া রে'-র মতো অজস্র গানে মানুষকে উদ্বেল করে তুললেন তিনি! আশির দশকে 'তুমসে মিলকে', 'সিলি হাওয়া ছু গই', 'বাদল ইঁউ গরজতা হ্যায়', 'জিন্দেগি পেয়ার কা গীত হ্যায়'-এর মতো গান শুনতে পেল দর্শক-শ্রোতারা। নব্বইয়ের দশক আর একবিংশ শতাব্দীতে এসেও লতা মঙ্গেশকর আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করে দিলেন 'কুছ না কহো', 'তু মেরে সামনে', 'কভি ম্যায় কহুঁ', 'জিয়া জ্বলে', 'ও পালন হারে', 'হামকো হামিসে চুরালো'-র মতো অবাক করা গানের মাধ্যমে!

এছাড়াও তাঁর গাওয়া 'অ্যায় মেরে ওয়তন কে লোগোঁ' গানটি তো এক অবিস্মরণীয় উচ্চতায় পৌঁছেছে! আজও এই গান আমাদের চোখ ও হৃদয় ভিজিয়ে দেয়!

এখন এভাবে দশক ধরে গানগুলি বলার কারণ হল ষাট বছরের বেশি সময় ধরে এভাবে কেউ যে সমকালীন থেকে যেতে পারে, তা আমরা লতা মঙ্গেশকরের গান না শুনলে জানতে পারতাম না। চল্লিশের গান, তার সুর, কথা, মনোভাব ও অভিব্যক্তির সঙ্গে ২০০০ সাল পরবর্তী সময়ের গান, সুর, কথা, বাদ্যযন্ত্র, মনোভাব, অভিব্যক্তির আকাশপাতাল তফাত। আমরা দেখেছি, সময়ের যে বদল তার সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে কত গায়ক গায়িকা হারিয়ে গিয়েছেন, বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছেন! আর সেখানেই লতা মঙ্গেশকরের জয়! তিনি দশকের পর দশক ধরে সমস্তরকম গানের সঙ্গে নিজেকে বদলেছেন। গায়কি বদলেছেন। আঙ্গিক বদলেছেন। কিন্তু তাও মানুষের মনকে স্পর্শ করতে, সেখানে চিরকালীন স্থান করে নিতে তাঁর অসুবিধে হয়নি! আমি দেখেছি আমার ঠাকুরদাও তাঁর সময়ের লতার গানে যেমন আচ্ছন্ন। তেমন আমার বাবাও তাঁর সময়ের গানে মুগ্ধ। আবার আমি আমার সময়ের ও আমার পরবর্তী প্রজন্ম তাদের সময়ে একই ভাবে লতা মঙ্গেশকরের গানের ভক্ত!

লতা মঙ্গেশকর তাই চিরকালীন ভারতের দশক ভিত্তিক ছায়াছবির গানের প্রতীক। সেখানে সেমি ক্লাসিকাল থেকে পপ, লোকসঙ্গীত থেকে কনটেম্পোরারি- সমস্ত রকম গানে তাঁর পারদর্শীতা আমাদের অবাক করে দেয়! একজন মানুষের মধ্যে এতটা বৈচিত্র ও মুন্সিয়ানা দেখতে পাওয়া বিরলতম ঘটনা!

লতা মঙ্গেশকর এক ইন্টারভিউতে আফশোষ করেছেন যে ভারতীয় মার্গসংগীতে তিনি সেভাবে সময় দিতে পারেননি। এটা তাঁর সারাজীবনের একটা দুঃখ! আরেক জায়গায় হাসির তলায় বিষণ্ণতা ঢেকে বলেছেন, আরেকটা জীবন পেলে তিনি আর লতা মঙ্গেশকর হয়ে জন্মাতে চান না। কারণ লতা মঙ্গেশকরের যে কষ্ট, যে বেদনা, তা কেবল লতা মঙ্গেশকরই জানেন! এই কথায় এসে, এত সম্মান, পুরস্কার, মুগ্ধতা এড়িয়েও, আমরা দেখি এমন একজন মানুষকে, যিনি নাম-যশের চেয়ে আনন্দময়, সহজ জীবনকেই বেঁচে থাকার পাথেয় করতে চেয়েছেন সারাজীবন! তাই পরেরবার জন্ম গ্রহণ করলে আর লতা মঙ্গেশকর হতে চাননি!

তাঁর কথায় মহম্মদ রফি, কিশোর কুমার, তালাত মেহমুদ সহ অনেক গায়কের কথা উঠে এসেছে! আমরা দেখেছি নিজে ওই মাপের শিল্পী হয়েও সহশিল্পীদের প্রতি তাঁর সম্ভ্রম, তাঁর মুগ্ধতার দিক! যা আসলে তাঁকে প্রকৃত মানুষ হিসেবেই চিহ্নিত করে!

আমরা দেখেছি সংগীত পরিচালকদের প্রতি তাঁর সম্মান আর ভালবাসার কথা। শচীন দেব বর্মণের সঙ্গে তাঁর সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি হলেও তা পরে মিটে গিয়েছিল। লতা মঙ্গেশকর পরে বলেছেন, 'Burman dada was very fond of me. He made a special kheer which he shared with no one except me. He would say, "As long as there's 'Lota' — that's what he called me — I've nothing to worry about.' বাংলাতেও লতা মঙ্গেশকরের অনেক গান রয়েছে যা আজও আমাদের বিস্মিত ও মুগ্ধ করে। সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সুরে 'আকাশ প্রদীপ জ্বলে' গানটি আজও আমাদের মধ্যে এক অদ্ভুত আলোড়ন তোলে! সলিল চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুধীন দাশগুপ্তর সুরে লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া বাংলা গানগুলি আমরা কি কোনওদিন ভুলতে পারব? প্রায় দুশোর কাছাকাছি বাংলা গান গেয়েছেন লতা মঙ্গেশকর, যার অধিকাংশই আমাদের আজও মুগ্ধ করে।

এই বছর আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন সুরসম্রাজ্ঞী। তিনি আর নতুন কোনও গান গাইবেন না! তবু তিনি তো ভারতের নাইটিঙ্গেল! তাই তাঁর সুরেই আমাদের জীবনের ঋতু পরিবর্তন হবে। হতে থাকবে।

সেই ছোট্ট ছেলেটা যে একদিন তাঁর গান শুনে মুগ্ধতায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, সে এখন বড় হওয়ার পরেও সেই গানের মুগ্ধতা ছেড়ে বেরতে পারেনি। তাঁর গলায় 'আমি যে তোমারই শুধু / জীবনে মরণে / ধরিয়া রাখিতে চাহি / নয়নে নয়নে'... শুনে আজও তার ও তার মতো বহু মানুষের সবকিছু বেভুল হয়ে যায়! বিহ্বলতা কাটতে চায় না।

এই যে শ্রোতার মনে থেকে যাওয়া, গানের মাধ্যমে তার সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে ওঠা, এটাই যে কোনও প্রকৃত শিল্পীর শিল্পের সার্থকতা। সেই বিচারে লতা মঙ্গেশকর একজন কালজয়ী শিল্পী! তাই তিনি এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েও, থেকে গিয়েছেন আমাদের সুখ দুঃখের সঙ্গে! থেকে গিয়েছেন আমাদের জীবনের সমস্ত আনন্দ ও বেদনায়! লতা মঙ্গেশকর- সুর সম্রাজ্ঞী! আমাদের হৃদয়ে তাঁর রাজত্ব চিরকাল অমলিন!